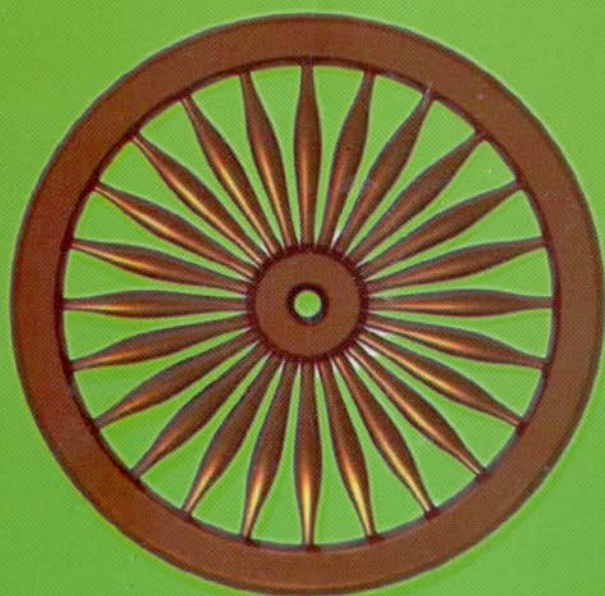


ধর্মের ছায়া



ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

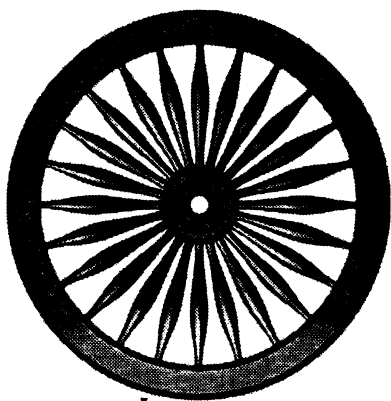
কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Dayamitra Bhante

ধর্মের ছায়া



ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু

ধর্মের ছায়া

গ্রন্থকার :

ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু

প্রকাশকাল :

শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা

৩১ জুলাই ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৪২২ বঙ্গাব্দ, ২৫৫৯ বুদ্দাব্দ

প্রকাশক :

সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ

গ্রন্থ সংশোধনে :

ভদন্ত শাক্যজ্যোতি ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব :

গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ :

ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু

প্রচ্ছদ :

সৈকত আচার্য্য

সহযোগিতায় :

ভদন্ত শাসনা রক্ষিত ভিক্ষু

মুদ্রণে :

এ্যাড পয়েন্ট

প্যারাগণ সিটি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৩-১৭৫৯৮১, ০১৮১৯৫৩৬৯২৭

উৎসর্গ

জানি, ব্রহ্মাসম মাতা-পিতার অনন্ত গুণের ঋণ
পুত্র কন্যাদের পক্ষে কোন বস্তু, সেবা-পূজাদি দ্বারা
পরিশোধ করা সম্ভবপর নহে । তথাপি শুধুমাত্র ব্রহ্মাসম
মাতা পিতার অনন্ত গুণের প্রতি পূজা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা
স্মরণ করে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস “ধর্মের ছায়া”
এইটি পিতা দিরিচান তঞ্চঙ্গ্যা এবং মাতা
চাংমাবী তঞ্চঙ্গ্যার নিরোগ, দীর্ঘায়ু জীবন সহ
নির্বাণ লাভের হেতু হোক এই মঙ্গল কামনায়
উৎসর্গ করলাম ।

ইতি
ভদন্ত দীপালোক ভিক্ষু

আশীর্বাদ বাণী

ধর্ম এবং অধর্ম এরা উভয়ে পরস্পর প্রতিপক্ষধর্ম। সেহেতু ধর্ম এবং ধর্মের প্রতিফল কখনো এক হয় না-তা সর্বদা ভিন্নতাই ধারণ করে থাকে। দিবালোকের দ্বারা পৃথিবী যেমন আলোকিত হয় এবং পথিকেরা নিজ নিজ গন্তব্য মার্গাদি দর্শন করে; ঠিক তদ্রূপভাবে যারা ধর্মের আলোতে (জ্ঞানে) আলোকিত হন তখন তারা কুশল-অকুশল, পাপ-পুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল, সুখ-দুঃখ ও ধর্ম-অধর্মাদি বিষয়ে স্বয়ং যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন। অন্যদিকে অমাবস্যার রাত যেমন সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং পথিকের গন্তব্য মার্গাদি অদৃশ্য করে দেয়; ঠিক তদ্রূপভাবে যখন অধর্মও মানুষের অন্তরে বাসা বাঁধে তখন মানুষেরা কুশল-অকুশল, পাপ-পুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল ও ধর্ম-অধর্মাদির জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়। মূলতঃ ধর্ম হচ্ছে উত্তম জীবন গঠনের একটি মহোত্তম মার্গ বা উপায় যা অবলম্বনের দ্বারা নিজেই পরম সুখে সুখী হওয়া যায় এবং অন্যদেরকেও সুখে বাঁচতে দেওয়া যায়। মানুষেরা ধর্মের মূলার্থ বুঝে না বলেই ধর্মাচারের প্রতি অসচেতন, অনগ্রসর ও বিমুখ হয়ে থাকে। তারা যদি ধর্মের মূলার্থ বুঝতে সক্ষম হতো তাহলে বস্ত্র পরিধানের ন্যায় সদা সর্বদা ধর্মকে অন্তরে ধারণ করে রাখত এবং ধর্ম প্রতিপালন করতে কখনো বিমুখ হতো না। আমার প্রিয় শিষ্য আয়ুস্মান দীপালোক ভিক্ষু কর্তৃক লিখিত “ধর্মের ছায়া” নামে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা করতে যাচ্ছে জেনে আমি অতীব আনন্দিত হয়েছি। সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারের তাগিদে এই শুভ প্রয়াস অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য। আমি এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসারের কামনা করছি।

আশীর্বাদান্তে....

ভদ্র উঃ পঞ্ঞানন্দ মহাথের

অধ্যক্ষ, রোয়াংছড়ি কেন্দ্রীয় জৈতবন বৌদ্ধ বিহার

রোয়াংছড়ি, বান্দরবান।

নিবেদন

“ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং ছত্তং মহত্তং যথা বস্সকালে,
এসানিসংসো ধম্মে সুচিন্ণে, ন দুগ্গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী’তি” ।

অর্থাৎ মহাছত্র যেমন বৃষ্টি বর্ষণের সময় ছত্র ধারণকারীকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি ধর্মও ধর্মচারীকে (সমস্ত দুর্গতি বা দুঃখ থেকে) রক্ষা করে থাকে। ধর্মচারণে সুঅভ্যস্থ হলে এর সুফল লাভ হয় এবং ধর্মচারীরা কখনো দুর্গতি বা দুঃখময় স্থানে জন্ম গ্রহণ করে না। আসলে আমরা যে ধর্ম ধর্ম বলি কিন্তু কয়জনেইবা আমরা ধর্মের মূলার্থ বুঝতে পারি? আমরা যদি ধর্মের মূলার্থ বুঝতে সক্ষম হতাম, তাহলে আমরা কখনো ধর্মচারণ না করে বা ধর্মকে রক্ষা না করে অবস্থান করতে পারতাম না। এমনকি জীবনের বিনিময়ে হলেও ধর্মচারণ করতে সচেষ্ট হতাম। মূলতঃ আমরা ধর্মের মূল স্বরূপ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত নই বিধায় এরূপ ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ ধর্মকে লাভ করা সত্ত্বেও ধর্মচারণের প্রতি এত উদাসীন, অনিহা, ধর্মের অনাদর এবং ধর্মের প্রতি অসচেতন হয়ে থাকি। আসলে ধর্ম এর মানে কোন তত্ত্ব-মন্ত্র কিংবা কোন অলৌকিক বলতে কিছু নয়। ধর্ম হল একটি সুন্দর জীবন গঠন করার বা পরম সুখ-শান্তি লাভের ও লৌকিক এবং লোকুত্তর জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের সর্বোত্তম নিকটতম পন্থা। যাহা নিজ জীবনে স্বয়ং উপলব্ধি করার যোগ্য। তাহলে ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ এই মহান ধর্মকে কিভাবে আমরা লাভ করতে পারি? ধর্মকে জানতে হলে বা লাভ করতে হলে নিম্নে প্রদত্ত পাঁচটি সরল উপায় সমূহকে অবলম্বন করতে হবে। সেগুলো হলঃ

১. মনযোগ সহকারে স্বধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে হবে
২. ধর্মাভিজ্ঞা ভিক্ষু বা শ্রামণগণের সাথে ধর্মালোচনা করতে হবে
৩. ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে
৪. ধর্মাভিজ্ঞা ভিক্ষু বা শ্রামণগণের নিকট অজ্ঞাত ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে
৫. এবং যথাযথভাবে ধর্মচারণ করতে হবে

উপরোক্ত পাঁচটি উপায় সমূহ হচ্ছে ধর্মকে জানার বা উপলব্ধি করার সবচাইতে নিকটতম পন্থা। তার মধ্যে প্রথম চারটি হল পরিযুক্তি বিভাগ। অর্থাৎ ব্যবহারিক বা প্রাথমিকভাবে ধর্মকে জানার উপায়। আর শেষের পঞ্চমটি হল পটিপত্তি বিভাগ। অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা ধর্মকে জানার বা উপলব্ধি করার উপায়। সুতরাং এখানে জেনে রাখা ভালো যে, পরিযুক্তি শিক্ষা ও পটিপত্তি ধর্ম এই দু'য়ের সুসমন্বয় হলেই তখন ধর্মের প্রকৃতি স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং পটিবোধ বা ধর্মের সুফল লাভ করা যায় - অন্যথায় সুদূর পরাহত। মূলতঃ ধর্ম আর ধর্ম ইহা আমাদেরই স্বকীয় সৃষ্টিমাত্র। এই ধর্মধর্ম দ্বয় কোন বাহিরের বস্তু বা বাহিরে অবস্থান করে না। এরা সর্বদা আমাদের এই ব্যাম প্রমাণ (সাড়ে তিন হাত) শরীরের মধ্য হতে জাত বা উৎপন্ন ধর্ম মাত্র এবং এর অভ্যন্তরেই বিদ্যমান। ধর্মধর্ম দ্বয় আলো আধারের সাথে তুলনীয়। আলোর বিদ্যামানে যেমন অন্ধকারের অবিদ্যমানতা এবং অন্ধকারের বিদ্যামানে আলোর অবিদ্যমানতার ন্যায় যার নিকট ধর্ম বিদ্যমান তার নিকট অধর্মের অবিদ্যমানতা এবং যার নিকট অধর্ম বিদ্যমান তার নিকট ধর্মের অবিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ধর্মধর্ম পরস্পর প্রতিপক্ষ স্বভাবের। একের উপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি সদৃশ। কাজেই এটা জেনে রাখা দরকার যে, আপনি ধর্মকে স্বীকার করুন বা নাই করুন কিন্তু আপনি সর্বদা ধর্মের অধীনে। প্রতিনিয়ত আপনার কাছ থেকে দু'টো ধর্মের সৃষ্টি হয়ঃ একটি ধর্ম (কুশল ধর্ম) আর অন্যটি অধর্ম (অকুশল বা পাপ ধর্ম)। আপনি যখন ধর্মের অধীনে অবস্থান করবেন, তখন আপনার দ্বারা কুশল বা পুণ্যকর্মের সৃষ্টি হয় এবং যখন আপনি অধর্মের অধীনে অবস্থান করবেন, তখন আপনার দ্বারা অকুশল বা পাপ কর্ম সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা গেল যে, আপনি সর্বদা ধর্ম কিংবা অধর্মের অধীনে অবস্থান করে থাকেন। আপনি কি জানেন পার্থিব জীবনে আপনার এত মঙ্গলামঙ্গল বা সুখ-দুঃখ কেন ভোগ করতে হয়? ইহা কেবল আপনার স্বকৃত ধর্মধর্মের কারণেই ভোগ করতে হয়। ধর্মের দ্বারা মানুষ সুখ-শান্তি লাভ করে এবং অধর্মের দ্বারা মানুষ দুঃখ-অশান্তি লাভ করে থাকে। তাই মহাকারণিক তথাগত সম্যক সমুদ্র

ধর্মাচারণের মহোপকারীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন :

“উত্তিষ্টে নল্পমজ্যেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরমহি চাতি” ।

অর্থাৎ জাগ্রত হও, প্রমত্ত হইয়না; উত্তমরূপে ধর্মাচরণ কর । ধর্মচারী হও এবং পরলোকে সুখে বাস করে ।

আসলে সত্যি কথা বলতে কি এই “ধর্মের ছায়া” গ্রন্থটিতে আমার নিজস্বতা বলতে কিছুই নেই । কেবলমাত্র ত্রিপিটক এবং ধর্মাভিজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত বহু ধর্ম গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করে ধর্মের বিষয় সারাদি চয়ন পূর্বক নিজের ক্ষুদ্র মেধা-মনন শক্তির দ্বারা মোট এগারটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করে এই গ্রন্থটিতে যোজনা করেছি মাত্র । জানিনা, ধর্মপিপাসু বিজ্ঞ পাঠক/পাঠিকাগণের কাছে গ্রন্থটি কতটুকু সমাদৃত হবে । তবে গ্রন্থটি রচনার কালে প্রত্যেক বিষয় বস্তুগুলো সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করার আশ্রয় প্রয়াস করেছি । শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুদ্রণ জনিত ত্রুটি গ্রন্থে থাকতে পারে, আশা করি বিজ্ঞ পাঠক মণ্ডলী তা নিজ গুণে সংশোধন পূর্বক পাঠ করবেন । গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে যে সকল গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি, সে সকল বিজ্ঞ লেখকগণের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার একান্ত প্রার্থনায় মদীয় উপাধ্যায় গুরু রোয়াংছরি কেন্দ্রিয় জেতবন বিহারের বিহারাধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় উঃ পঞ্ণানন্দ মহাথের মহোদয় গ্রন্থটিতে মূল্যবান আর্শিবাদ বাণী লিখে দিয়ে আমাকে অত্যাধিক স্নেহের পাশে আবদ্ধ করেছেন । আমি পূজ্য গুরুর প্রতি বিনম্র বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । অত্র গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে দিয়েছেন আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ভদন্ত শাক্যজ্যোতি ভিক্ষু এবং গ্রন্থটি রচনা কালে সর্বাধিক সহযোগিতা করেছেন স্নেহভাজন ভদন্ত শাসনা রক্ষিত ভিক্ষু । তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাচ্ছি । বইটি প্রকাশনা করতে গিয়ে যাদের কথা উল্লেখ না করে পারছি না; গ্রন্থটি টাইপিং করার জন্য শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা অনিতা তঞ্চঙ্গ্যা নিজের ল্যাপটপটি প্রদান করে গ্রন্থটির প্রকাশনার কাজ গতি বৃদ্ধি করেছেন এবং গ্রন্থটি

প্রকাশনার্থে শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করে দিয়ে প্রভূত পুণ্যের অধিকারী হয়েছেন উপাসিকা দেবী তঞ্চঙ্গ্যা এবং উপাসিকা সুনন্দা তঞ্চঙ্গ্যা। আমি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও মৈত্রী চিন্তে পুণ্যদান করছি। যাদের শ্রদ্ধাদান না পেলে হয়তো বা আদৌ গ্রন্থটি প্রকাশনার মুখ দেখতে পেত না; যে সকল শাসন হিতকামী শ্রদ্ধাবান উপাসক এবং উপাসিকা বৃন্দ অত্র গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধাদানের হাত প্রসারিত করেছেন আমি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সকল দাতাগণের শ্রদ্ধাদান মৈত্রী চিন্তে স্মরণ করছি। পরিশেষে, আমার দানময়, শীলময় ও ভাবনাময় সঞ্চিত পুণ্যরাশি সকল দাতাগণের উদ্দেশ্যে দান করছি, এর পুণ্যের ফলে দাতাগণের নিরোগ-ধর্মময় দীর্ঘায়ু জীবন ও সর্ব মঙ্গল সিদ্ধি সহ নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক— এরূপ মঙ্গল কামনা করছি।

“জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক”

ইতি

ভদ্র দীপালোক ভিক্ষু

আবাসিক : বিমুক্তি সুখ মহাসতিপট্টান বিদর্শন

ভাবনা কেন্দ্র, বাগমারা, বান্দরবান।

ধর্মের ছায়া

সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১. সমজীবী সংস্রব	১-৩
২. একটি কুশল ও অকুশল কর্মের মানদণ্ড	৪-৮
৩. ছয় প্রকার দান	৯-১৫
৪. ধর্মকে জানার চারটি গুণ ধর্ম	১৬-২০
৫. স্ত্রীলোকের বুদ্ধত্ব প্রার্থনা	২১-২৫
৬. দানের পাঁচটি সুফল	২৬-২৯
৭. স্বপ্ন এবং তার কারণ	৩০-৩৪
৮. স্রোতাপন্ন পুদ্গালেরা অপায়ে গমন করেনা	৩৫-৪৮
৯. তিন প্রকার বিপ্রলাস ধর্ম	৪৯-৫২
১০. পঞ্চ নিয়ম	৫৩-৬০
১১. মহা অসংস্কৃত ধাতু নির্বাণ	৬১-৬৭

সমজীবী সংস্রব

সাংসারিক জীবনে কোন স্বামী-স্ত্রী যদি উভয়ে একই উত্তম ও মহৎ মন মানসিকতা নিয়ে সংসার ধর্ম প্রতিপালনে সচেষ্ট হন, তাহলে তারা একে অপরের প্রতি প্রীত ও সম্ভ্রষ্ট মনে গৃহী জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এরূপ মনোভাব পোষণ করে যে, “আমরা এতদিন যাবত সংসার ধর্ম প্রতিপালন করে আসছি অথচ এখনো পর্যন্ত একে অপরের প্রতি কোন মিথ্যা কথা বলা, খারাপ আচার-আচারণ করা বা অন্যায় জনক আচরণ করা, দুঃখ-মনো কষ্ট দেওয়া অথবা কায়িক-বাকনিক-মানসিকভাবে অধর্মাচারণ দৃষ্টি গোচর হয় নাই। আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অনেক অনেক সুখ ও শান্তিতে অবস্থান করছি। অতএব আমরা ইহ জীবনে যেরূপ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, ঠিক সেরূপ ভাবে পর জন্মে বা ভবিষ্যত জন্মেও আমরা যেন স্বামী-স্ত্রী হয়ে একে অপরের দর্শন লাভের ইচ্ছা করি।” এভাবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পর জন্মে একে অপরের দর্শন লাভ করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে তা পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই চারটি ধর্ম যথাযতভাবে প্রতিপালন করতে হবে। বুদ্ধ এই বিষয়ে অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতে সমজীবী সূত্রে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। একদা বুদ্ধ ভগ্নরাজ্যের সুসুমার গিরিস্থ ভেসকলাবন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বুদ্ধ পূর্বাহ্ন সময়ে পাত্র চীবর গ্রহণ পূর্বক গৃহপতি নকুলপিতার গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট হলে গৃহপতি নকুলপিতা ও গৃহপত্নী নকুলমাতা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। তারপর গৃহপতি নকুলপিতা বুদ্ধকে এরূপ বললেন “ভান্তে, যখন গৃহপত্নী নকুলমাতা নিতান্তই অল্পবয়স্কা ছিল, তখন তাকে আমার গৃহে আনা হয়েছিল। সে হতে আমি তাকে মনে মনেও পাপাচারিণী বলে জানিনা আর তাকে কায়িকভাবে কিরূপে পাপাচারিণী বলে জানব? ভান্তে, আমরা ইহ জন্মে যে ভাবে একে অপরকে দর্শন করছি, ভবিষ্যত জন্মেও ঠিক সে ভাবে একে অন্যকে দর্শন করতে ইচ্ছা পোষণ করি”। অতঃপর গৃহপত্নী নকুলমাতাও এরূপ বললেন-“যে সময়ে আমি

নিতান্তই অল্পবয়স্কা ছিলাম তখনই আমাকে গৃহপতি নকুলপিতার গৃহে আনা হয়েছিল। সে হতে আমি গৃহপতি নকুলপিতাকে মনে মনেও পাপাচারী বলে জানিনা। আর কিরূপে গৃহপতি নকুল পিতাকে কায়িকভাবে পাপাচারী বলে জানব? ভাঙে, আমরা বর্তমান জন্মে যে ভাবে একে অন্যকে দর্শন করছি, ঠিক সেভাবে ভবিষ্যত জন্মেও একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছা পোষণ করি।” অতঃপর বুদ্ধ বললেন - “হে গৃহপতি ও গৃহপত্নী যদি কোন স্বামী-স্ত্রী বর্তমান জন্মে যে ভাবে একে অপরকে দর্শন করছে, ঠিক সে ভাবে ভবিষ্যত জন্মেও একে অপরকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাদেরকে উভয়ে অবশ্যই চারটি ধর্ম সমভাবে অনুশীলন বা রক্ষা করতে হবে। সে চারটি ধর্ম হলঃ ১. সমাসন্ধা হোতি ২. সমাসীলা হোতি ৩. সমাচাগা হোতি ৪. সমাপঞঃ হোতি।

(ক) সমাসন্ধা হোতি - বলতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সকল বিষয়ে সমশ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকাকেই বুঝায়। যেমনঃ ত্রি-রত্নের প্রতি, কর্ম ও কর্মফলের প্রতি, মাতা-পিতা ও গুরু আচার্য্যের প্রতি, ইহ জীবন ও পর জন্মের প্রতি এবং একে অপরের প্রতি সমপরিমাণ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকা ইত্যাদি। এভাবে স্বামী-স্ত্রী সকল বিষয়ে সম শ্রদ্ধায় স্থিত হয়ে অবস্থান করাকেই “সমশ্রদ্ধা সংশ্রব” বলে।

(খ) সমাসীলা হোতি বলতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সম-শীলাচারন সম্পন্ন হওয়াকেই বুঝাই। যেমনঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে

১. প্রাণী হত্যা হতে বিরত হওয়া

২. চুরি করা হতে বিরত হওয়া

৩. মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হওয়া

৪. মিথ্যা কথা বলা হতে বিরত হওয়া

৫. মদ বা নেশা দ্রব্য সেবন করা হতে বিরত হওয়া ইত্যাদিকেই বুঝায়। এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম-শীলে স্থিত হয়ে অবস্থান করাকে “সমশীল সংশ্রব” বলে।

(গ) সমাচাগা হোতি - বলতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দান দেওয়ার ক্ষেত্রে

বা ত্যাগ করার ক্ষেত্রে একমনা বা একচিত্ত হওয়াকেই বুঝায়। যেমনঃ ভিক্ষু সংঘকে দান দেওয়ার ক্ষেত্রে, মাতা-পিতাকে সেবা ও সহায়তা করার ক্ষেত্রে, আত্মীয়-স্বজনকে সহযোগিতা করার সময়ে এবং যাচকদেরকে দান দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে একই দান চিত্ত বা ত্যাগ চিত্ত থাকতে হবে। এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সমত্যাগ ধর্মে স্থিত হয়ে অবস্থান করাকে “সমত্যাগ সংশ্রব” বলে।

(ঘ) সমপঞ্ঞ হোতি - বলতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে জ্ঞানের পরিধি বা জ্ঞানের মাপকাঠি একই পর্যায়ে হওয়া বা সম জ্ঞানী হওয়াকে বুঝায়। যেমনঃ আচার-আচরণে, আলাপ-আলোচনায়, কুশলাকুশল কর্মে বা পাপ-পুণ্য ধর্ম সহ ইত্যাদিতে সম-জ্ঞান থাকা। এভাবে সকল বিষয়ে সমজ্ঞান নিয়ে অবস্থান করাকে “সমজ্ঞানী সংশ্রব” বলে। যে সকল স্বামী-স্ত্রী উপরোক্ত চার প্রকার ধর্ম সমূহকে সমান ভাবে আচরন বা রক্ষা করেন, তারা ইহ জীবনেও দৈহিক ও মানসিক সুখে সুখী হন এবং প্রভূত পুণ্য কর্ম করার কারণে মরণের পর উভয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে দিব্য সুখ লাভ করতে সক্ষম হন। আর পরিশেষে অনাগতে নির্বাণ লাভ করার পূর্বে তারা অবশ্যই একে অপরকে দর্শন করতে সক্ষম হবেন।

একটি কুশল ও অকুশল কর্মের মানদণ্ড

একটি মানুষের দু'টি দিক থাকে। একটি ভালো দিক আর অন্যটি খারাপ দিক। এই ভালো আর খারাপ দিক নিয়েই মানুষের জীবন প্রবাহিত হয়ে থাকে। একজন মানুষ যখন ভালোর দিকটা ধারণ করে তখন তার জীবন দীবালাকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয় আর যখন কেউ খারাপ দিকটা ধারণ করে তখন তার জীবন অমাবস্যা রাতের ন্যায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সেহেতু যারা জ্ঞানী তারা শষ্য ক্ষেতে আগাছাদি উপড়ে ফেলার ন্যায় খারাপ দিকটা বর্জন করেন এবং শষ্যদি রক্ষা করার ন্যায় ভালো দিকটা প্রতিপালন বা রক্ষা করে থাকেন। কাজেই জ্ঞানীরা সর্বদা কুশল কর্ম সম্পাদন করেন আর অকুশল কর্মকে বর্জন বা ত্যাগ করেন। বুদ্ধের সমকালীন সময়ে এক মহিলা নিজের কুশল ও অকুশল কর্মের অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। তার নাম ছিল খুজ্জুত্তরা। এখানে “খুজ্জ” এবং “উত্তরা” এই দু'টি শব্দের সমন্বয়েই খুজ্জুত্তরা শব্দটি গঠিত। খুজ্জ শব্দের অর্থ কুজ আর উত্তরা ছিল তার আসল নাম। জন্ম লগ্ন হতে সে কুজ বলেই তাকে সবাই খুজ্জুত্তরা নামে ডাকত। মূলত খুজ্জুত্তরা ছিল রাণী শ্যামাবতীর দাসী। রাজা উদয়ন রাণী শ্যামাবতীকে পুষ্প ক্রয় করার জন্য প্রতিদিন আট মুদ্রা প্রদান করতেন আর রাণী শ্যামাবতী সে আট মুদ্রা প্রদান করতেন দাসী খুজ্জুত্তরাকে পুষ্প ক্রয় করার জন্য। সে হতে খুজ্জুত্তরা আট মুদ্রাকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজে চুরি করত আর অবশিষ্ট একভাগ দিয়ে পুষ্প ক্রয় করে তা রাণী শ্যামাবতীকে প্রদান করতেন। একদা পুষ্প বিক্রেতা সুমন মালাকার বুদ্ধ এবং ভিক্ষু সংঘকে পিণ্ডদান করছিলেন নিজ বাড়িতে। তখন তিনি খুজ্জুত্তরাকে ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং সেই সুবাদে খুজ্জুত্তরা অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে লাগলেন, যাতে ধর্ম দেশনার মূল অর্থ যথাযতভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যখন তিনি ধর্ম দেশনা শ্রবণ করছিলেন, তখন তিনি গভীরভাবে ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এরূপে খুজ্জুত্তরা ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে করতে ধর্ম দেশনা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফলে প্রতিষ্ঠিত

হলেন। ধর্ম দেশনা শেষ হওয়ার পর তিনি আট মুদ্রার মূল্যের পুষ্প ক্রয় করলেন এবং প্রসাদে এসে তা রাণী শ্যামাবতীকে প্রদান করলেন। সচরাচর প্রত্যেক দিনের তুলনায় আজ দু'গুণ পরিমাণ বেশী পুষ্প হওয়ার কারণে রাণী শ্যামাবতী দাসী খুজ্জুত্তরাকে জিজ্ঞাসা করলেন - “রাজা উদয়ন কি আজ অধিক পুষ্প ক্রয় করার জন্য আরো আট মুদ্রা দিয়েছেন নাকি?” উত্তরে দাসী খুজ্জুত্তরা বললেন ‘না’- ইহা আট মুদ্রারই পুষ্প। পূর্বে আমি আপনার প্রদত্ত অর্থের অর্ধাংশ চুরি করতাম আর বাকি একাংশ দিয়ে পুষ্প ক্রয় করে তা আপনাকে প্রদান করতাম। কিন্তু আজ আট মুদ্রার পুষ্পই এনেছি। এভাবে দাসী খুজ্জুত্তরা যথাসত্য উত্তর দিলেন। এই কথা শুনে রাণী শ্যামাবতী খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং জানতে চাইলেন কেন তিনি আজ চুরি করলেন না আর মিথ্যা কথাও বললেন না। তার পর খুজ্জুত্তরা বললেন যে, তিনি আজ চুরি ও মিথ্যা কথা না বলার কারণ হল, সে আজ বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করেছে। তখন রাণী শ্যামাবতী চিন্তা করলেন, যার দেশনা শ্রবণ করে লোকের এরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন ও কল্যাণ সাধিত হয়, না জানি বুদ্ধ কত মহান ও জ্ঞানী হবেন। এভাবে চিন্তা করতে করতে রাণী শ্যামাবতী বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার খুবই ইচ্ছুক হলেন এবং খুজ্জুত্তরাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি যে রূপ বুদ্ধের নিকট ধর্ম দেশনা শ্রবণ করেছ, ঠিক সেরূপ ভাবে তা বলতে পারবে কি?। খুজ্জুত্তরা উত্তর দিলেন হ্যাঁ আমি পারব। আমি বুদ্ধের নিকট যা যা ধর্ম দেশনা শ্রবণ করেছি তা অনুরূপ বলতে পারব। তারপর রাণী শ্যামাবতী খুজ্জুত্তরাকে উত্তম বস্ত্র ও যথাযোগ্য আসন প্রদান করে ধর্ম দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করলেন। দাসী খুজ্জুত্তরা বুদ্ধের কাছ থেকে যে রূপ ধর্ম দেশনা শ্রবণ করেছিল ঠিক সেরূপ ভাবে ধর্ম দেশনা প্রদান করতে লাগলেন। দেশনা শ্রবণ করতে করতে রাণী শ্যামাবতী ও তার পাঁচশত দাসী সহ সকলেই দেশনা শেষান্তে শ্রোতাপত্তি মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

শ্রোতাপন্ন হওয়ার পর তারা আরো বেশী বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক হলেন। সেহেতু তারা খুজ্জুত্তরাকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ

করলেন, যাতে বুদ্ধ যা কিছু ধর্ম দেশনা প্রদান করে তা যেন শ্রবণ করতে পারে এবং পরে এসে যেন তা তাদেরকে পুনঃরায় শ্রবণ করাতে পারে। এভাবে খুজ্জুত্তরা প্রতিদিন বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করত এবং পরে তা এসে রাণী শ্যামাবতী সহ পাঁচশত দাসীকে বুদ্ধের অনুরূপ ধর্মদেশনা শ্রবণ করাত। এই প্রকারে খুজ্জুত্তরা শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত কেবল মাত্র দেশনা শ্রবণ করে করে ত্রিপিটক শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করলেন। একদা বুদ্ধ ধর্ম দেশনা প্রদান করার কালে বললেন, আমার গৃহি উপাসিকা-বহুশ্রুতাদের মধ্যে খুজ্জুত্তরাই ‘অগ্রগণ্যা’ বলে এই উপাধি প্রদান করলেন। এক সময় কিছু ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে খুজ্জুত্তরার অতীত ও বর্তমান বিষয়ে জানার ইচ্ছুক হয়ে তারা বুদ্ধকে চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে বুদ্ধ!

১. খুজ্জুত্তরা কিসের কারণে কুজো হয়েছে?
 ২. কিসের হেতুতে খুজ্জুত্তরা কেবলমাত্র দেশনা শ্রবণ করে ত্রিপিটক শাস্ত্রে বহুশ্রুতা প্রাপ্ত হলেন?
 ৩. কিসের ফলে খুজ্জুত্তরা দেশনা শ্রবণ করার কালে এত শীঘ্রই শ্রোতাপন্ন হয়েছেন?
 ৪. কিসের কারণে খুজ্জুত্তরা আর্য ধর্ম লাভ করার সত্ত্বেও দাসী হয়েছে?
- অতঃপর বুদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রশ্নের উত্তরে খুজ্জুত্তরার অতীত জন্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমার পূর্বে কশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর বারাণাসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজ প্রাসাদে এই খুজ্জুত্তরা তখন দাসী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল।

(ক) যে কারণে খুজ্জুত্তরা কুজো হয়েছেঃ

একদা আটজন পচেক বুদ্ধ রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজ প্রাসাদে পিণ্ডাচারণের জন্য আগমন করেছিলেন। কিন্তু সে আটজন পচেক বুদ্ধের মধ্য এক জন পচেক বুদ্ধ কুজো ছিল। পচেক বুদ্ধগণকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দান করার পর তখন সে দাসী একখানা লাল বস্ত্র পরিধান করে এবং একটি সুবর্ণ পাত্র গ্রহণ পূর্বক “আমাদের পচেক বুদ্ধ এরূপ বিচরণ করেছেন” বলে তা অনুকরণ পূর্বক কুজের ন্যায় হয়ে পচেক বুদ্ধের বিচরণাকার দেখিয়েছিল এবং সেখানে দর্শনরত

সকলেই তা নিয়ে হাস্য করেছিল। হে ভিক্ষুগণ! পচেক বুদ্ধকে এরূপ ব্যঙ্গ ছলে উপহাস করার অকুশল কর্মের কারণে জন্ম লগ্ন হতেই খুজ্জুত্তরা কুজো হয়ে জন্ম নিয়েছে।

(খ) যে কারণে খুজ্জুত্তরা ক্ষিপ্র বুদ্ধিমতি সম্পন্ন হয়েছেঃ

যখন আটজন পচেক বুদ্ধগণ পিণ্ডচারণের জন্য রাজ প্রাসাদে আগমন করেছিল, তখন পচেক বুদ্ধগণের পাত্রে উত্তম আহার দ্বারা পাত্র পূর্ণ করা হয়েছিল। ফলে পাত্রগুলো গরম হয়ে গেল। তখন পচেকগণ নিজ নিজ পাত্রগুলো হাতের উপর রাখা অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। এমতাবস্থায় পচেক বুদ্ধগণ নিজ নিজ পাত্রগুলো কিছুক্ষণ ডান হতে আর কিছুক্ষণ বাম হতের উপর রাখতে শুরু করে দিল। এরূপ পরিস্থিতি দেখে দাসী খুজ্জুত্তরা অতি শীঘ্র গমন পূর্বক নিজের আটখানা হস্তিদন্তের নির্মিত বলয় বা বালা প্রদান করে বললেন, “ভান্তে, আপনাদের পাত্র বলয়ের উপর রেখে ভোজন করুন এবং এগুলো আপনাদেরকে শ্রদ্ধাচিহ্নে দান করছি” বলে দান দিলেন। হে ভিক্ষুগণ! দাসী খুজ্জুত্তরা এরূপে পচেক বুদ্ধগণকে দান করার ফলে ইহজন্মে এত ক্ষিপ্র বুদ্ধিমতি ও কেবলমাত্র ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে করে ত্রিপিটক শাস্ত্রে পারদর্শীতা ও বহুশ্রুতা লাভ করেছে।

(গ) যে কারণে খুজ্জুত্তরা দেশনা শ্রবণ করার কালে শ্রোতাপন্ন হয়েছেঃ যখন পচেক বুদ্ধগণ রাজ প্রাসাদে আগমন করেছিলেন, তখন খুজ্জুত্তরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পচেকবুদ্ধগণকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিবেশনাদির দ্বারা সেবা করেছিল। হে ভিক্ষুগণ! পচেক বুদ্ধগণকে এরূপ সেবা করার পুণ্যের ফলে দাসী খুজ্জুত্তরা ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার কালে শ্রোতাপন্ন হয়েছে।

(ঘ) যে কারণে খুজ্জুত্তরা দাসী হয়েছেঃ

কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে খুজ্জুত্তরা বারাণাসীতে এক শ্রেষ্ঠি কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিল। এক সন্ধ্যায় যখন তিনি একটি বিরাট আয়নার সম্মুখে বসে রূপ সাজ-সজ্জায় রত ছিল, তখন এক বিশ্বস্তা অরহত ভিক্ষুণী তার সাথে কোন এক প্রয়োজনীয় ব্যাপারে দেখা করতে গিয়েছিল। সে মুহূর্তে তার নিকট কোন দাসী না থাকার কারণে শ্রেষ্ঠি কন্যা অরহত

ভিক্ষুণীকে বললেন “আর্য্য, বন্দনা করছি, আমার ঐ গহনার বাস্ত্রটি এনে দিন” বলে নির্দেশ দিয়েছিল। অতঃপর অরহত ভিক্ষুণী চিন্তা করলেন যে, আমি যদি তা নিয়ে না আসি তা হলে শ্রেষ্ঠির কন্যা আমার উপর খুবই ক্রোধান্বিত হবেন এবং এর পাপ কর্মের ফলে তাকে অবশ্যই নরকে গমন করে অতুলনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, আর যদি আমি গহনার বাস্ত্রটি নিয়ে আসি তা হলে সে পাপ কর্মের ফলে শ্রেষ্ঠির কন্যা পাচঁশত জন্ম পর্যন্ত দাসী হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হবে। কাজেই অরহত ভিক্ষুণী ভাবলেন যে, দু’প্রকার অকুশল কর্ম বিপাকের মধ্যে নরকের দুঃখ ভোগ করার চাইতে দাসী হয়ে দুঃখ ভোগ করাই শ্রেয় বলে মনে করলেন। এরূপ চিন্তা করার পর অরহত ভিক্ষুণী শ্রেষ্ঠির কন্যার নির্দেশিত গহনার বাস্ত্রটি আনায়ন করে দিয়েছিল। হে ভিক্ষুগণ, অরহত ভিক্ষুণীকে দাসীর ন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেওয়াতে এর পাপ কর্মের ফলে সে হতে খুজ্জুত্তরাকে পাচঁশত জন্ম পর্যন্ত দাসী হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। সুতরাং এই সবই ছিল দাসী খুজ্জুত্তরার অতীত জন্মের কুশলাকুশল কর্মের পুরস্কার।

ছয় প্রকার দান

প্রত্যেক বৌদ্ধরাই প্রভূত পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে থাকেন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, পুণ্য সঞ্চয় করা খুবই প্রয়োজন। কেননা এই মনুষ্য জীবন তথা সুগতি জীবন পুণ্যের উপর নির্ভরশীল। এই দৃঢ় বিশ্বাস টুকু নিয়েই বৌদ্ধরা নিজেদের সামর্থ্য ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে দান দিয়ে, শীল প্রতিপালন করে এবং ভাবনা অনুশীলন করে প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে থাকেন। এভাবে বৌদ্ধরা বিবিধ উপায়ে দান দিয়ে তথা নানা প্রকারে পুণ্য কর্মাদি সম্পাদন পূর্বক উৎসর্গ জল ঢেলে এই বলে প্রার্থনা করেন,- “এই পুণ্যরাশি আমাদের পরলোকগত সকল জ্ঞাতিগণের সুখের কারণ হোক, এই পুণ্যরাশি যতদিন না মোক্ষ লাভ না হবে ততদিন পর্যন্ত ছায়ার ন্যায় আমাদের সুগতি এবং সুখ-শান্তি লাভের কারণ হোক এবং এই পুণ্য রাশি সকল সত্ত্বগণের সুখের কারণ হোক” ইত্যাদি বলে কামনা - প্রার্থনা করে থাকেন।

এই ধরনের বৌদ্ধ দান-দাতারা সর্বদা জানতে ইচ্ছুক হন যে, কোন বস্তু দান করলে কি কি ফল লাভ হয় এই বিষয়ে। একারণে একদা এক জনৈক দেবতা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন - কোন্ কোন্ বস্তু দান করলে কি কি ফল লাভ হয় এই প্রশ্ন নিয়ে। তখন বুদ্ধ সে জনৈক দেবতাকে ছয় প্রকার দানীয় বস্তুর কথা এবং সে দানের - ফল নিয়ে দেশনা প্রদান করেছিলেন।

সে ছয় প্রকার দান বস্তু ও দান ফল সমূহ হল :

১। যিনি উত্তম আহার, ফল-ফুট, ও মিষ্টান্ন জাতীয় খাদ্য -পানীয়াদি দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে স্বাস্থ্যবান এবং বলবান হন।

২। যিনি চীবর বা বস্ত্র আদি দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে - সু-বর্ণের অধিকারী হন।

৩। যিনি যান দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে কায়িক ও মানসিক সুখ লাভ করেন।

৪। যিনি প্রদীপ দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে উত্তম দৃষ্টি শক্তি লাভ করেন।

৫। যিনি বিহার দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে চারটি সুফল (স্বাস্থ্যবান, রূপবান, সুখী ও উত্তম দৃষ্টি) লাভ করে থাকেন।

৬। যিনি ধর্ম দান করবেন, তিনি নির্বান সাক্ষাত করতে সক্ষম হন।
যাদের দান দেওয়ার প্রতি দান-চেতনা রয়েছে এবং দান কার্য সম্পাদন করেন, সে দানের সুফল সম্বন্ধেই বুদ্ধ এই ধর্ম দেশনা দান-দাতাদের মঙ্গলার্থে ভাষণ করেছিলেন।

(ক) আহার দানের দ্বারা সু-স্বাস্থ্যবান ও বলবান হওয়া যায় :

উক্ত হয়েছে যে, যারা উত্তম আহার, ফল-মূল ও সুমিষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দান করে, তারা জন্ম জন্মান্তরে সু-স্বাস্থ্যবান ও বলবান হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাকঃ যেমন কেউ যদি দুই বা তিন দিন যাবত খাদ্য অভাবে অনাহারে দিনাতিপাত করে, তাহলে তিনি এতই দৈহিকভাবে দুর্বল হয়ে যাবে - যার ফলে তিনি দৈনিক নিজের কাজ-কর্ম তথা নিজস্ব ব্রত কর্মাদি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন তিনি উত্তম খাদ্য-ভোজ্য আহার করেন, তখন তিনি পুনঃরায় শক্তি লাভ করে এবং নিজ কর্মাদি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়ে থাকে। সে কারণে যিনি উত্তম আহার দান করেন তিনি অপরকে দৈহিক শক্তি দান করার ন্যায় হয়ে থাকে। সে হেতু আহার দাতাগণ জন্ম জন্মান্তরে সু-স্বাস্থ্যবান ও বলবান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। বুদ্ধ আহার দাতাগণ জন্ম জন্মান্তরে পাঁচটি সুফল লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলঃ

১. দীর্ঘায়ু জীবন লাভ করে
২. সুশ্রী তথা সুবর্ণের অধিকারী হয়
৩. দৈহিক ও মানসিক সুখ লাভ করে
৪. সু-স্বাস্থ্যবান ও বলবান হয়
৫. প্রজ্ঞার অধিকারী হয়

আহার দাতাগণ উক্ত পাঁচটি সুফল লাভ করার জন্য প্রার্থনা করতে হয় না। তারা প্রার্থনা ব্যতীরেকেই সে পাঁচটি সুফল লাভ করে থাকেন।

(খ) চীবর বা বস্ত্র দানের দ্বারা রূপবান হওয়া যায় :

যারা চীবর বা বস্ত্র দান করেন, তারা জন্ম জন্মান্তরে রূপবান হয়ে থাকেন। যেমনঃ যদি কোন ব্যক্তি দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু তার পরিধানকৃত বস্ত্রাদি নিতান্তই মলিন ও জীর্ণ-ছিন্ন। এমতাবস্থায় তখন

তাকে দেখতে খুবই অসুন্দর ও কুৎসিত দেখাবে এবং লোকেরা তাকে দেখতে বিরুচি বোধ করবে। যদি সে লোকটি উত্তম বস্ত্র পরিধান করতঃ তা হলে তাকে আরো অধিক সুন্দর ও মনোরম দেখাত। অন্যদিকে যাকে দেখতে তেমন একটা সুন্দর দেখায় না তারপরও সে যদি উত্তম ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে, তখন তাকে দেখতে অনেক বেশী সুন্দর দেখাবে। সে কারণে যারা চীবর বা বস্ত্র দান করে তারা জন্ম জন্মান্তরে সুশ্রী বা সৌন্দর্য্যতা লাভ করে থাকে। এই সুশ্রী বা সৌন্দর্য্যতা লাভ বিষয়ে আরো চারটি উপায় রয়েছে। সে চারটি উপায় হলঃ

১. উত্তম ও উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দান করলে
২. উত্তম চীবর, বস্ত্র, বুদ্ধ মূর্তি এবং বিহার ও চৈত্যাদিতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য উপকরণ সামগ্রী দান করলে
৩. বিহার তথা চৈত্য প্রাঙ্গনাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলে
৪. হিংসা করা থেকে বিরত থাকলে বা হিংসা মূলক কর্ম বর্জন করলে উক্ত চারটি পুণ্য কর্ম কেউ যদি সম্পাদন করে তাহলে সেও জন্ম জন্মান্তরে দৈহিক সৌন্দর্য্যতা লাভ করে থাকে।

(গ) যান দানের দ্বারা সুখ সম্পত্তি লাভ করা যায় :

উক্ত হয়েছে যে, যিনি যান দান করেন, তিনি দৈহিক এবং মানসিক সুখ সম্পত্তি লাভ করতে সক্ষম হন। যিনি দীর্ঘ রাস্তা যান, ছত্র বা জুতা ব্যতীত পরিভ্রমণ করেন, তখন তাকে অনেক রোদ ও ঠাণ্ডায় ক্লিষ্ট হতে হয় এবং তাকে অনেক দুর্বল ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। আর যদি কেউ দীর্ঘ রাস্তা ছত্র, জুতা অথবা মোটর চালিত যান দিয়ে পরিভ্রমণ করেন, তাহলে তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে তেমন কোন কষ্ট ভোগ না করে অনায়াসে ও সুখে পৌঁছাতে সক্ষম হন। সে হেতু যিনি যান দান করেন, তিনি দৈহিক ও মানসিকভাবে সুখ করতে সক্ষম হয় থাকেন।

যানের মধ্যে ভিক্ষু এবং শ্রামণেরা তির্যক প্রাণীর চালিত যানে আরোহণ করতে পারে না। যেমনঃ হাতি, গরুও অশ্বের চালিত যান ইত্যাদি।

এখানে “যান দান” বলতে – ছত্র, জুতা, হাঁতিবার যষ্টি, পালঙ্ক, চেয়ার, সেতু, সিঁড়ি, রাস্তা-ঘাট সংস্কার করা, ভিক্ষু বহণ করার বাহন,

জল যান বোট এবং মোটর চালিত যান ইত্যাদি এসবই যান দানের অন্তর্গত দান বলে উক্ত।

যেহেতু যারা এই জাতীয় যান দান করেন, তারা অন্যদের দুঃখ-কষ্ট লাগব করেন এবং সুখী করে থাকেন। সেহেতু যান দাতাগণও জন্ম জন্মান্তরে সুখ সম্পত্তি লাভ করতে সক্ষম হন।

(ঘ) প্রদীপ দানের দ্বারা উত্তম দৃষ্টি লাভ হয় :

বলা হয়েছে যে, যিনি প্রদীপ দান করেন, তিনি উত্তম দৃষ্টি লাভ করে থাকেন। তার অর্থ হলঃ ধরা যাক, যখন চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন লোকেরাও দর্শন করা উচিত এমন বিহার, বুদ্ধ মূর্তি ও চৈত্যাди দর্শন করতে সক্ষম হন না। কেবল মাত্র যখন চারদিক আলোকিত থাকে তখনই তিনি বিহার, বুদ্ধ মূর্তি চৈত্যা তথা দৃশ্যালম্বণ দর্শন করতে সক্ষম হন - অন্যথা অসম্ভব।

সে কারণে যারা প্রদীপ দান করেন, তারা উত্তম দৃষ্টি শক্তি লাভ করে থাকেন। কাজেই যারা মনুষ্যালোক তথা দেব লোকে উত্তম দৃষ্টি শক্তি তথা দিব্যচক্ষুলাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাদেরকে অবশ্যই বিহারে, বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে ও চৈত্যাতে প্রদীপ, বাতি, ল্যাম্প ও ইলেক্ট্রিকের বাস্ফ আদি দান করা উচিত।

(ঙ) বিহার দানের দ্বারা চারটি সম্পত্তি লাভ করা যায় :

যারা বিহার দান করেন, তারা জন্ম জন্মান্তরে চারটি সম্পত্তি লাভ করতে সক্ষম হন। সেগুলো হলঃ

১. যখন কোন ভিক্ষু অনাহারে দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি দৈহিক ভাবে খুবই ক্লান্ত ও অবসন্নতা বোধ করে থাকেন। সে যখন কোন একটি বিহারে প্রবেশ পূর্বক শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন, তাহলে তখন তিনি ক্লান্তি ও অবসন্নতা দূর করে পুনঃরায় দৈহিক শক্তি লাভ করতে সক্ষম হন। সেহেতু যিনি বিহার দান করেন, তিনি জন্ম জন্মান্তরে বিহার দানের ফলে দৈহিক বা কায়িক শক্তি লাভ করে থাকেন।

২. যখন কোন ভিক্ষু প্রচণ্ড রোদ-দুপুরে দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি সূর্যের তাপে বিষম দগ্ধ বিদগ্ধ হন এবং এর ফলে তখন তাকে দেখতে ঘর্মাক্ত, কদমাক্ত ও অসুন্দর লাগে। কিন্তু যখন বিহারে গমন

পূর্বক জল দ্বারা হাত-পা-মুখ প্রক্ষালন করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন, তাহলে তখন তাকে দেখতে পুনঃরায় সুন্দর লাগে। এই কারণে যে বিহার দান করেন, সে জন্ম জন্মান্তরে সুদর্শন বা সুশ্রী হয়ে থাকেন।

৩. যে সকল ভিক্ষু শ্রমণ বিহারের অভাবে বাহিরে ঝাড়-জঙ্গলে অবস্থান করতে হয়, তখন তাদেরকে নান প্রকার বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের দংশন খেতে হয় এবং শীত ও গরমের কারণে দৈহিক এবং মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পক্ষান্তরে যে সকল ভিক্ষু শ্রামণ বিহারে অবস্থান করে, তারা সে সকল উপদ্রব জনিত দুঃখ যন্ত্রণাদি হতে মুক্ত হয়ে দৈহিক ও মানসিকভাবে সুখে অবস্থান করতে সক্ষম হন। তখন তারা বিহারে নিরাপদে অবস্থান করে মনযোগের সহিত ত্রিপিটক শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে এবং দ্রুত গতিতে তারা ত্রিপিটক শাস্ত্রে পারদর্শীতা অর্জন করে থাকে। সে কারণে যারা বিহার দান করেন, তারা জন্ম জন্মান্তরে দৈহিক ও মানসিক সুখ লাভ করে থাকেন। যারা এরূপ নিরাপদ বিহারে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেন, তারা খুব শ্রীঘ্রই প্রীতি লাভ করতে পারেন। এই অধিগত প্রীতি কায়িক ও মানসিক সুখকে পরিবর্দ্ধিত করে থাকে আর এই সুখ ভাবনা অনুশীলনকারীর মনকে দ্রুতগতিতে সমাধিস্থ করে এবং সমাধি বিদর্শন জ্ঞানকে বর্দ্ধিত করণ পূর্বক নাম-রূপের কার্য কারণ স্বভাব ধর্মকে যথাযতভাবে জ্ঞাত হয়ে থাকে। আর যখন বিদর্শন জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন তারা মার্গ ও ফল জ্ঞান লাভ করে নির্বাণ অধিগত করে থাকেন।

৪. যারা দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করেন, তখন বায়ু, গরম ও সূর্যের খড়া তাপে তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ পায় এবং দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। আর যখন বিহারে প্রবেশ পূর্বক নিরাপদে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন, তখন তাদের দৃষ্টি শক্তি পুনঃরায় লাভ হয় এবং দৃষ্টি ঝাপসা মুক্ত হয়ে যায়। সেহেতু যারা বিহার দান করে, তারা জন্ম জন্মান্তরে উত্তম ও বিশুদ্ধ দৃষ্টি শক্তি লাভ করে থাকে।

(চ) ধর্ম দানের দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায় :

ধর্ম দানের দ্বারা নির্বাণ লাভ করার অর্থ হল ; যখন সত্ত্বগণ ধর্ম দেশনা শ্রবণ করা হতে বঞ্চিত হয়, তখন সত্ত্বগণ দান, শীল ও বিদর্শন ভাবনা

অনুশীলন করতে অক্ষম হন। সেহেতু তখন সত্ত্বগুণ নির্বাণ লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ যখন ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করে, তখনই তারা দান, শীল, শমথ ভাবনা এবং বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। একারণে যারা ধর্ম দান করেন, তারা নির্বাণ লাভ করে থাকেন। ধর্ম দেশনা দান করতে শতজন তথা সহস্র শ্রোতার প্রয়োজন হয় না, একজন শ্রোতাকেই ধর্ম দান করা যায়। এখানে বিবিধ উপায়ে ধর্ম দান করা যায়। যেমন : মূল পালি ত্রিপিটক ও অর্থকথা শিক্ষা দেওয়া, ধর্ম বিষয়ে অজানা এমন কোন কিছু বিষয় কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে এর সঠিক উত্তর দেওয়া, ভাবনা কর্মস্থান বিষয়ে যথাযত নির্দেশনা দেওয়া এবং ধর্ম দেশনার আয়োজন করা - এই সবই ধর্ম দানের অন্তর্গত দান। এই সকল ধর্ম দানই নির্বাণ লাভের সহায়ক দান হয়ে থাকে।

যদি মাতা-পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নী, কাকা-কাকী, মামা-মামীরা তথা বয়োজ্যেষ্ঠরা একরূপ বলে পুত্র-কন্যা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী ও ভ্রাতৃপুত্র পুত্র সন্তান-সন্ততিদেরকে উপদেশ প্রদান করেন -

- “তুমি প্রাণী হত্যা করবে না। যদি প্রাণী হত্যা কর, তাহলে তুমি পর জন্মে অল্পায়ু সম্পন্ন হবে। আর যদি তুমি প্রাণী হত্যা করা হতে বিরত হও, তাহলে তুমি পর জন্মে দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হবে।”
- “তুমি পরের অদত্ত বস্তু গ্রহণ তথা চুরি করবে না। যদি অপরের সম্পত্তি চুরি কর, তাহলে তুমি বিষয় সম্পত্তির অভাব ও দরিদ্র হবে। আর যদি চুরি করা হতে বিরত হও, তাহলে তুমি পরজন্মে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হয়ে ধনী হবে।”
- “তুমি অন্যের পুত্র-কন্যার সাথে মিথ্যা কামাচার করবে না। যদি কর, তাহলে লোকেরা তোমাকে ঘৃণা ও হিংসা করবে। আর যদি তুমি মিথ্যা কামাচার করা হতে বিরতি হও, তাহলে তুমি সকলের প্রিয়পাত্র হবে।”
- “তুমি মিথ্যা বাক্য বলবে না। যদি মিথ্যা বাক্য বল, তাহলে লোকেরা তোমার বাক্য শ্রবণ করবে না, মান্য করবে না এবং সকলের অবিশ্বাসের পাত্র হবে। আর যদি মিথ্যা বাক্য ভাষণ না

কর, তাহলে লোকেরা তোমাকে বিশ্বাস করবে এবং তোমার বাক্যকে যথায়তভাবে মান্য করবে।

- “তুমি মদ্যপান তথা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করবে না। যদি কর, তাহলে তুমি উন্মাদ, স্মৃতিভ্রম, লঘুমস্তিক, বুদ্ধিহীন হয়ে কোন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। আর যদি তুমি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করা হতে বিরত হও, তাহলে তুমি উত্তম স্মৃতিমান, বুদ্ধি সম্পন্ন ও যে কোন কিছু অতীব তাড়াতাড়ি শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে ইত্যাদি।” এভাবে শিক্ষা দেওয়াকেই ধর্মদান বলে। যেহেতু এই শিক্ষাও নির্বাণ লাভের সহায়তা করে থাকে।

ধর্মকে জানার চারটি গুণ ধর্ম

অনেকে মনে করে যে, বুদ্ধের ধর্ম শাসন আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার কারণে আর এখন আর্য পুদ্রাল হওয়ার অর্থাৎ শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত্ত্ব মার্গ ফল লাভ করার সময় অতীত হয়ে গেছে। আর কিন্তু এখনো পর্যন্ত অনেকে আছে যারা বিশ্বাস করে যে, যদিও বা বুদ্ধের ধর্ম শাসন আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, তথাপি আর্য পুদ্রাল তথা মার্গ ফল করা সম্ভব। উপরোক্ত দু'প্রকারের লোক কথা প্রসঙ্গে তার যথাযত ব্যাখ্যা অর্থকথাচার্যগণ প্রদান করে গেছেন। অর্থকথাচার্যগণের মতানুসারে পাট হাজার বৎসর বুদ্ধের ধর্ম শাসন স্থিতি কালে যথাভূত ধর্মচরণের মাধ্যমে যে যে ভাবে আর্য পুদ্রাল হওয়া যাবে বা মার্গ ফল লাভ যাবে তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

১. প্রতীসম্বিদা প্রাপ্ত অরহত্তগণের শাসন কাল এক হাজার বৎসর। অর্থাৎ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কাল হতে এক হাজার বৎসরের মধ্যে অনেক পুদ্রাল বিদ্যমান থাকেন, যারা অরহত্ত্ব মার্গ-লাভ করার পরও আরো “প্রতীসম্বিদা” নামক আলাদা চারটি জ্ঞান (অর্থ প্রতীসম্বিদা, নিরুজ্জি প্রতীসম্বিদা, ধর্ম প্রতীসম্বিদা ও প্রতিভাণ প্রতীসম্বিদা) লাভ করতে পারেন। সে কারণে উক্ত আলাদা চারটি জ্ঞান অধিগতকারী অরহত্তগণকে “প্রতীসম্বিদা অরহত্ত” বলা হয়।
২. ষড়্ভাজ্ঞা প্রাপ্ত অরহত্তগণের শাসন কাল এক হাজার বৎসর। অর্থাৎ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কাল হতে দ্বিতীয় এক হাজার বৎসরের মধ্যে অনেক পুদ্রাল বিদ্যমান থাকেন, যারা ছয়টি জ্ঞান (দিব্যচক্ষু জ্ঞান, দিব্যশ্রুত জ্ঞান, ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান, পরচিন্তা বিজ্ঞান জ্ঞান, জাতিস্মরণ জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান) নিয়ে অরহত্ত্ব মার্গ ফল লাভ করে থাকেন। সে কারণে উক্ত ছয়টি জ্ঞানলাভী অরহত্তগণকে “ষড়্ভাজ্ঞা অরহত্ত” বলা হয়।
৩. ত্রি-বিদ্যা প্রাপ্ত অরহত্তগণের শাসন কাল এক হাজার বৎসর। অর্থাৎ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কাল হতে তৃতীয় এক হাজার বৎসরের মধ্যে অনেক পুদ্রাল বিদ্যমান থাকেন, যারা ত্রিবিদ্যা বা তিনটি জ্ঞান

(দিব্যচক্ষু জ্ঞান, পূর্বনিবাস জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান) নিয়ে অরহত্ব মার্গ ফল লাভ করে থাকেন। এরূপ ত্রিবিদ্যা জ্ঞান অধিগতকারী অরহতগণকে “ত্রিবিদ্যা অরহত” বলে।

৪. সুক্ষ্ম বিদর্শক অরহতগণের শাসন কাল এক হাজার বৎসর। অর্থাৎ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কাল হতে চতুর্থ একহাজার বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু পুণ্ডল বিদ্যমান থাকেন, যারা সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন কল্যাণ মিত্র বিদর্শনাচার্য কাছ থেকে বিদর্শন ভাবনার কর্মস্থান বা শিক্ষা গ্রহণ পূর্বক দৃঢ়বীর্য ও স্মৃতিমান হয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের স্বভাব ধর্ম উদয়-বিলয় এবং লক্ষণত্রয়কে (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণ) বিদর্শন জ্ঞানের দ্বারা যথাভূতভাবে দর্শন করতঃ বিদর্শন জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা ও তৃষ্ণাকে সমূলে ক্ষয় করে কেবলমাত্র আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ পূর্বক অরহত্ব মার্গ-ফল লাভ করে থাকেন। এরূপ আসবক্ষয় জ্ঞানলাভী অরহতগণকে “সুক্ষ্ম বিদর্শক অরহত” বলা হয়।

৫. শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ও অনাগামী মার্গ-ফললাভী গণের শাসনকাল একহাজার বৎসর। অর্থাৎ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কাল হতে পঞ্চম একহাজার বৎসরের মধ্যও কিছু কিছু পুণ্ডল বিদ্যমান থাকেন, যারা সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন কল্যাণ মিত্র বিদর্শনাচার্য কাছ থেকে বিদর্শন ভাবনার কর্মস্থান বা শিক্ষা গ্রহণ পূর্বক দৃঢ়বীর্য ও স্মৃতিমান হয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলের মাধ্যমে নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের স্বভাব ধর্ম উদয়-বিলয় এবং লক্ষণত্রয়কে (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণ) বিদর্শন জ্ঞানের দ্বারা যথাভূতভাবে দর্শন করতঃ বিদর্শন জ্ঞানের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী মার্গ ও ফলজ্ঞান অধিগত করে থাকেন। কাজেই উক্ত অর্থকথাচার্যগণের ব্যাখ্যানুসারে ইহা জানা যায় যে, বুদ্ধের ধর্মের শাসন যতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত যথাযত ধর্মচারণের দ্বারা অবশ্যই মার্গ-ফল লাভ করা সম্ভব। অর্থকথাচার্যগণের ভাষ্য মতে ধর্মকে ধারণ করতে বা অধিগত করতে চারটি গুণ ধর্মের প্রয়োজন। সেগুলো হলঃ

১. বুদ্ধপ্লাদক্খনো - বুদ্ধ উৎপত্তির সময়ে। অর্থাৎ বুদ্ধ উৎপন্ন হলেই এই ধর্ম আচরন বা প্রতিপালনের সুযোগ হয়ে থাকে।
২. মজ্জিমদেসেউপত্তিক্খনো - মধ্য-প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করলে। অর্থাৎ যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করলে এই ধর্ম প্রতিপালনের সুযোগ লাভ হয়ে থাকে।
৩. সম্মাদিটিঠ্যালক্খনো - সম্যক দৃষ্টি লাভ করলে বা সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হলে।
৪. ছন্নমাযতনানমবেকলরক্খনো - ষড়েন্দ্রিয় সমূহ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন)পরিপূর্ণভাবে লাভ করলে। উপরোক্ত চার প্রকার ধর্ম সমূহ লাভ করলেই কেবলমাত্র এই আর্য ধর্ম লাভ করার সুযোগ হয়ে থাকে।

(ক) বুদ্ধপ্লাদক্খনো - যখন বুদ্ধগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন না, তখন বুদ্ধের ধর্ম শাসন বিদ্যমান থাকেনা। যার কারণে সত্ত্বগণ ধর্মাচরণ করতে ইচ্ছুক হলেও তারা তখন ধর্মাচরণ করতে পারেনা। যেহেতু তখন আর্য ধর্ম লাভের চারি স্মৃতিপ্রস্থান বিদর্শন ভাবনা সম্পূর্ণভাবে অবিদ্যমান থাকে। এই কারণে ধর্মাচরণ করতে না পারার ফলে তারা আর্য ধর্ম লাভ করতে পারেনা। যখন কেউ মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং তখন যদি বুদ্ধ অবির্ভূত হন ও তার ধর্ম শিক্ষা বিদ্যমান থাকে কেবলমাত্র সে সময়ই ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে, চারি স্মৃতিপ্রস্থান বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করতে এবং নিজ নিজ পারমীর বলে আর্য পুদাল তথা শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফলাদি লাভ করতে পারা যায়। এ কারণে কেবল মাত্র বুদ্ধগণ উৎপন্ন হলে এবং বুদ্ধের শাসন বিদ্যমান থাকলেই আর্য ধর্মকে অধিগত করার সুযোগ হয়ে থাকে।

(খ) মজ্জিমদেসেউপত্তিক্খনো - যদিও বুদ্ধ এবং বুদ্ধের শাসন বিদ্যমান থাকে, কিন্তু যারা এমন স্থানে জন্ম গ্রহণ করে যেখানে বুদ্ধের শাসন প্রচারিত হয় নাই বা বুদ্ধের ধর্ম অবিদ্যমান, তখন তারা ধর্ম দেশনা শ্রবণ কিংবা স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করতে পারে না। সেহেতু তারা আর্য ধর্ম তথা দুঃখ মুক্তি ধর্ম হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যেখানে বুদ্ধের শাসন বিদ্যমান থাকে এবং যদি সেখানে জন্ম গ্রহণ করলে, তখনই শাসনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পুণ্যকর্ম, ধর্মদেশনা শ্রবণ ও

স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করতে সক্ষম হওয়া যায়। সেই জন্য যারা মধ্য প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করে, কেবলমাত্র তারাই এই আৰ্য ধর্ম অনুশীলন করার সুযোগ লাভ করে থাকে। কাজেই যেখানে বুদ্ধের ধর্ম শাসন বিদ্যমান থাকে, সেখানে মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করলেই এই আৰ্য ধর্মাচরণ ও দুঃখ মুক্তি লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধের সময়ে যেখানে শাসন প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছে, সে ভারতবর্ষকেই মজ্ঝিমদেশ বা মধ্য-দেশ বলে গণ্য করা হত। কিন্তু বর্তমানে যে যে দেশে বা যে যে স্থানে বুদ্ধের শাসন ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত ও প্রচারিত হয়েছে, সে সে স্থান সমূহকেই মধ্যদেশ বা ধর্মাচরণে অনুকূল স্থান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

(গ) সম্মাদিটিষ্ঠিযালঙ্কক্খনো - বলতে যারা পুণ্য কর্ম বা দান করলে পুণ্য হয় এবং এই পুণ্য প্রত্যেক জন্মে নানাবিধ পুণ্যফল প্রদান করে তা বিশ্বাস করেনা, অকুশল কর্ম করলে যেমন প্রাণী হত্যা, চুরি ইত্যাদি অকুশল কর্ম চারি অপায়ে নিয়ে যায় তা বিশ্বাস করেনা এবং মনে করে যে, কেবল মাত্র ইহ জন্মই পরজন্ম বলতে কিছুই নাই ইত্যাদি। এরূপ মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা দান দেওয়া বা যে কোন পুণ্য কর্ম করতে পারেনা। সেহেতু তারা আৰ্য ধর্ম লাভের সহায়ক মহাস্মৃতিপ্রস্থান বিদর্শন ভাবনাও অনুশীলন করতে পারে না এবং কখনো দুঃখ মুক্তি তথা নির্বাণ লাভও করতে পারেনা। পক্ষান্তরে যারা পুণ্য কর্ম তথা দান করলে পুণ্য হয় আর এই পুণ্য অনির্বান কাল পর্যন্ত নানাবিধ পুণ্য ফল প্রদান করবে বলে বিশ্বাস করে এবং প্রাণী হত্যা, চুরি সহ নানাবিধ অকুশল কর্ম সত্ত্বকে অপায়ে নিয়ে যায় এবং নানাবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়, এরূপ বিশ্বাস করে তারা সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে নানাবিধ পুণ্য কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হন এবং আৰ্য ধর্ম তথা দুঃখ মুক্তি লাভের জন্য তারা স্মৃতিপ্রস্থান বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করতে সমর্থ হয়ে থাকেন। এভাবে তারা নিজেদের পারমীর গুণানুসারে আৰ্য পুদগল তথা শ্রোতাপত্তি মার্গ ফলাদি লাভ করে আৰ্য ধর্ম অধিগত করে থাকেন। সেজন্য যারা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন কেবল মাত্র তারাই আৰ্য ধর্ম লাভ করার সুযোগ লাভ করে থাকে।

(ঘ) ছন্নমায়তনানমবেকল্পক্খনো - বলতে যারা অন্ধ তারা বুদ্ধ বা বুদ্ধের প্রতিবিম্বকে বন্দনা নিবেদন করতে, বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন

কালে রূপালম্বনাদিকে স্মৃতি করতে এবং যারা শ্রবণে অক্ষম তারা ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে ও শব্দালম্বনাদিকে স্মৃতি অনুশীলন করতে পারে না। এভাবে যাদের নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মানসিক ভাবে বিকলগ্রস্থ বা ইন্দ্রিয় বিকলাঙ্গ তারা ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে এবং স্মৃতিপ্রস্থান বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করতে পারেনা। সে কারণে তারা আর্য ধর্ম তথা দুঃখ মুক্তি লাভ করতে অক্ষম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যাদের ষড়েন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় এবং মন) বিকলগ্রস্থ নয় তারা বুদ্ধের প্রতিবিম্বকে প্রণিপাত করতে, ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে এবং স্মৃতিপ্রস্থান বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করতে সক্ষম হন। আর নিজেদের পারমীর গুণাণুসারে তারা আর্য পুন্ডাল হন অর্থাৎ শ্রোতাপত্তি মার্গ - ফলাদি লাভ করতঃ আর্য ধর্মকে অধিগত করে থাকেন। সেহেতু, ইন্দ্রিয় বিকলাঙ্গ মুক্ত হওয়া ইহা একটি উত্তম সুযোগ আর্য ধর্মকে লাভ করার। যারা উপরোক্ত চারটি মহৎ সুযোগ লাভ করেছে, তারা যদি যথায়তভাবে স্মৃতিপ্রস্থান বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনে রত থাকেন, তারা অবশ্যই আর্য ধর্ম লাভ করতে সক্ষম হবেন। যারা সঠিক উপায়ে স্মৃতিপ্রস্থান বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেন; অথবা হয়তো অনেকে সব সময় অনুশীলন করতে পারেনা কেবল মাত্র খণ্ডকালীন স্মৃতি চর্চা করে থাকেন, তারপরও তারা ধর্মের প্রকৃতি স্বরূপকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন। আর যারা ধর্মের প্রকৃতিকে অবগত হয়েছেন, তারা আরো বেশী ধর্ম চর্চায় সচেষ্ট হন। ফলে তারা আগের চাইতে আরো বেশী ধর্ম চর্চার প্রতি আত্মবিশ্বাস লাভ করেন এবং তারা নিজেদের পারমীর গুণাণুসারে ধর্মকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সেহেতু ইহা জীবনেই নিজেদের আত্মবিশ্বাসে ধর্মকে উপলব্ধি করার কারণে তারা আরো বেশী দৃঢ় সংকল্প, উৎসাহী এবং অধ্যাবসায়ী হন। যাহা পরবর্তীতে বলবান স্মৃতিতে প্রতিপন্ন করায়। স্মৃতি বলবান হওয়াতে সমাধিও বলবান হয়ে থাকে। যদি সমাধি তীক্ষ্ণ বা সুগভীর হয়, তাহলে তখন বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হবে। আর যখন বিদর্শন জ্ঞান বলবান হয় আর মার্গাঙ্গের পরিপূর্ণতা লাভ হয় তখন তারা (যোগীরা) মার্গ ও ফল লাভ করে পরম শ্রেষ্ঠ নির্বাণকে অধিগত করতে সক্ষম হয়ে থাকেন।

স্ত্রীলোকের বুদ্ধত্ব প্রার্থনা

কিছু কিছু মহিলা আছে যারা চিন্তা করে যে, সব দিক দিয়েই নারীত্ব জীবন খুবই নিকৃষ্ট এবং তারা পুরুষদের শাসনাধীন। তারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেনা এবং বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনাও করতে পারেনা। এটা নিতান্তই অযৌক্তিক ও মিথ্যা ধারণা। নারীদেরও সমান অধিকার ও সুযোগ আছে। তারা চাইলে বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে পারে এরূপ উদাহরণ বুদ্ধের সমকালীন সময়েও পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধ যখন সপ্তম বর্ষাবাসে নিজ মাতাকে উপলক্ষ করে অভিধর্ম দেশনা প্রদান করার জন্য তাবতিংশ দেবলোকে গমন করেছিলেন, তখন তিনমাস ব্যাপী তাবতিংশ দেবলোকে বুদ্ধ অভিধর্ম দেশনা প্রদান করেছিলেন। অতঃপর বুদ্ধ আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে সংকশ্য নগরে পদার্পণ করব বললে তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেব সুদর্শন নগর হতে সংকশ্য নগর পর্যন্ত একপার্শ্বে স্বর্ণ, অপর পার্শ্বে রূপ্য এবং মধ্যস্থান হীরার দ্বারা সিঁড়ি নির্মাণ করে দিলেন। সে সময়ে বুদ্ধ সুদর্শন দেব নগরে দণ্ডায়মান হয়ে মনুষ্য ও দেব-ব্রহ্মাগণের প্রীতি উৎপত্তির জন্য ঋদ্ধি প্রতিহার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করতঃ একবার উর্দ্ধ দিকে এবং আর একবার নিম্নদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর সে ঋদ্ধি শক্তির প্রভাবে নিম্নে অবিচী নরক ও উর্দ্ধে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ষড়রশ্মি বিকশিত হল। সে ষড়রশ্মির প্রভাবে নাকি তৎ সময়ে মনুষ্যরা দেবতা ও ব্রহ্মাগণকে, ব্রহ্মারা দেবতা ও মনুষ্যগণকে এবং নিরয়বাসীরাও একে অন্যকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল। অতঃপর বুদ্ধ পদার্পণ কালে ব্রহ্মা বুদ্ধের মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধারণ করলেন, দেবরাজ ইন্দ্র ধারণ করলেন ধ্বজা এবং অন্যান্য দেবতারা নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্র ধারণ করতঃ মহা পূজা ও সৎকার করতে করতে দেবলোকের সুদর্শন নগর হতে সংকশ্য নগর পর্যন্ত দেব-ব্রহ্মারা বুদ্ধকে আগু বাড়িয়ে দিলেন। বুদ্ধের এরূপ প্রতিপত্তি ও প্রতিহার ঋদ্ধি দর্শন পূর্বক তখন ছত্রিশ (৩৬) যোজন ব্যাপী সমাগত লোকেরা বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেনি এমন কেউ ছিলনা। তখন নারী পুরুষ সব ভেদাভেদ অতিক্রম করে সকলেই বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিল। কাজেই উক্ত

উদাহরণের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, নারীরাও বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। যে নারী বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে, তাকে অবশ্যই সর্ব প্রথম পুরুষত্ব লাভ করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র একজন পরিপূর্ণ পুরুষই বুদ্ধ হতে পারেন। সে জন্য যে সকল নারী বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে বা অভিলাষী, তাদেরকে অবশ্যই সর্বাত্মে পরিপূর্ণ পুরুষত্ব জীবন প্রাপ্তির জন্য চারটি ধর্ম অনুশীলন ও পূর্ণ করতে হবে। সেগুলো হলঃ

১. ত্রি-রত্নকে শ্রদ্ধা ও পূজা করতে হবে

২. পঞ্চশীল প্রতিপালন করতে হবে

৩. নারী হওয়ার ইচ্ছা বর্জন করে নারী জন্মের প্রতি বীতরাগ সম্পন্ন হতে হবে

৪. পুরুষ হওয়ার ইচ্ছুক হওয়া এবং পুরুষত্ব জীবনকে পছন্দ করা

(ক) ত্রি-রত্নকে শ্রদ্ধা ও পূজা করা বলতে : বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ এবং সংঘের নয়গুণকে ত্রি-দ্বারে শ্রদ্ধা করা, বিশ্বাস করা শরণ গ্রহণ করা ও পূজা করাকেই বুঝায়। গুণ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সংঘরত্ন এই রত্নত্রয়কে শ্রদ্ধা এবং পূজা করা - ইহা পুরুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করার স্ত্রীলোকের একটি অনুকূল উপায় সদৃশ।

(খ) পঞ্চশীল প্রতিপালন করা বলতে : পঞ্চশীল প্রতিপালনের উপকারিতা ও পঞ্চশীল প্রতিপালন না করার অপকারিতা এই বিষয়ে যথাযতভাবে জ্ঞাত হয়ে পঞ্চশীল বা পাঁচটি নিয়মকে রক্ষা করাকে বুঝায়। পঞ্চশীল প্রতিপালনের উপকারিতা ও প্রতিপালন না করার অপকারিতা এই ভাবে জ্ঞাত হবেঃ

১. প্রাণী হত্যা করলে বা প্রাণীর জীবন নাশ করলে এর ফলে তাকে কেবল অপায়ে জন্ম গ্রহন করতে হবে তা নয়; অধিকন্তু তাকে জন্ম জন্মান্তরে অপরের দ্বারা মৃত্যু হওয়া, অল্লায়ু জীবন লাভ করা এবং নানাবিধ দ-ভোগ করতে হয়। অপরপক্ষে যারা প্রাণীহত্যা করে না বা প্রাণী হত্যা হতে বিরত হয়ে থাকে, তারা নির্বান লাভ না করা পর্যন্ত জন্ম জন্মান্তরে দীর্ঘায়ু সম্পন্ন, নিরোগী এবং সুবর্ণের অধিকারী হয়ে থাকেন।

২. যারা অপরের ধন-সম্পত্তি চুরি করে বা অপ্রদত্তবস্তু গ্রহণ করে,

তারা শুধুমাত্র দুঃখপূর্ণ স্থানে জন্ম গ্রহণ করে তা নয়; অধিকন্তু জন্ম জন্মান্তরে বিষয়-সম্পত্তির অভাব ও দারিদ্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। আর যারা চুরি করা হতে বিরত হয়ে থাকে তারা অনির্বান কাল পর্যন্ত জন্ম জন্মান্তরে ধনী ও প্রভূত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে।

৩. যারা মিথ্যা কামাচারে রত হয়, তারা কেবল অপায়ে জন্ম গ্রহণ করে তা নয়; অধিকন্তু তারা মানুষের অপ্রিয় হয়, নিন্দিত হয় এবং নানাবিধ কুবিপাকের দ্বারা দুঃখ ভোগ করে থাকে। আর যারা মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়ে থাকে, তারা মানুষের প্রিয় পাত্র হয়, শ্রদ্ধা-সম্মান লাভ করে এবং নির্বান লাভ না করা পর্যন্ত সুবিপাক লাভ করে থাকে।
৪. যারা মিথ্যা কথা বলে এবং পিশুন বা ভেদ বাক্য দ্বারা একে অপরের সম্পর্ক ভঙ্গের কারণ হয়, তারা শুধু অপায়ে জন্ম গ্রহণ করে তা নয়; অধিকন্তু তারা জন্ম জন্মান্তরে নানাবিধ বিপাক ভোগ করে থাকে। যেমনঃ লোকেরা তাদের কথা বিশ্বাস করে না আর এমনকি কোন সভা-সমিতি বা পরিষদে সত্য, উত্তম ও যুক্তিপূর্ণ কথা বললেও শ্রোতারা তা মূল্যায়ন করে না ইত্যাদি। অপরপক্ষে যারা মিথ্যা কথা না বলে সর্বদা সত্য বাক্য ভাষণ করে, তারা জন্ম জন্মান্তরে নানা প্রকার সুবিপাক লাভ করে এবং অনির্বাণ কালাবধি লোকেরা তাদের কথা শ্রবণে ইচ্ছুক হন, বিশ্বাস করেন এবং তাদের ভাষিত বাক্য লোকেরা যথাযতভাবে মূল্যায়ন করে থাকে।
৫. যারা সুরা-মদ বা নেশা দ্রব্য সেবন করে অর্থাৎ যা সেবনের দ্বারা লোকের কায়িক ও বাচনিক আচার-আচরন নিয়ন্ত্রণে থাকেনা এবং খারাপের দিকে ধাবিত হয়। এরূপ দ্রব্য সেবন বা পান করলে তারা কেবল অপায়ে গমন করে তা নয়; অধিকন্তু তারা জন্ম জন্মান্তরে স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়, লঘুমস্তিক, নির্বোধ ও উন্মাদ গ্রস্থ হয়ে থাকে। আর যারা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন বা পান করা হতে বিরত হয়, তারা নির্বান লাভ না করা অবধি জন্ম জন্মান্তরে মেধা-বুদ্ধি সম্পন্ন ও জ্ঞানী হয়ে থাকে। এরূপে পঞ্চশীল প্রতিপালনে

সুফল ও প্রতিপালন না করার কুফল সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হয়ে পঞ্চাশীল রক্ষা করা - ইহা একটি নারীদের অনুকূল পছন্দ নারী জীবন হতে পুরুষ জীবন লাভ করার ।

৬. (গ) নারী জীবনকে অপছন্দ করার কারণ : নারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করলে - চক্রবর্তী রাজা, দেবরাজ ইন্দ্র, মহাব্রহ্মা, পক্ষেবুদ্ধ এবং সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেও উক্ত পাঁচটি পদ-শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায় না । সেগুলো কেবলমাত্র পুরুষ হয়ে প্রার্থনা করলে এবং নিজের পারমী গুণের দ্বারা যথাযত লাভ হয়ে থাকে । সে জন্য নারীত্ব জীবনকে অপছন্দ করা এবং নারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হওয়া । উক্ত কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে । যেমনঃ

- ১) বিবাহ হলে মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ত্যাগ করে স্বামীর গৃহে চলে যেতে হয় ।
- ২) মাসিক পিরিয়ড বা নারী জাতীর মাসিক সংক্রান্ত বিষয়াদি বহন করতে হয় ।
- ৩) যথা সময়ে গর্ভবতী হতে হয় ।
- ৪) সন্তান প্রসব করতে হয় ।
- ৫) স্বামীকে সেবা-পরিচর্যা করতে হয় ইত্যাদি ।

এই কারণেও নারীরা নিজেদের জীবনকে অপছন্দ করে থাকে । এভাবে নারী জীবনকে অপছন্দ করা এবং নারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হওয়া - ইহাও একটি পুরুষত্ব বা পুরুষ জীবন লাভ করার নারীদের নিকটতম পছন্দ ।

(ঘ) পুরুষত্ব জীবনকে পছন্দ করার কারণঃ

পুরুষ হয়ে জন্ম নিলে চক্রবর্তী রাজা, দেবরাজ ইন্দ্র, মহাব্রহ্মা, পক্ষেবুদ্ধ এবং সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলে নিজ পারমীনুযায়ী পূর্ণ হয়ে থাকে । এহেতু পুরুষত্ব জীবনকে পছন্দ করা । উক্ত চারটি ধর্মকে যথাযতভাবে আচরন করলে যে একজন নারী পর জন্মে বা দ্বিতীয় জন্মে পুরুষত্ব জীবন লাভ করতে পারে, তা একটা উদাহরণের দ্বারা আমরা কিছুটা হলেও জানতে পারি ।

এক সময় কপিলাবস্ত্রতে গোপিকা নামে এক শাক্য কুমারী ছিল। সে বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সংঘরত্ন এই রত্নত্রয়ের প্রতি অতীব শ্রদ্ধা সম্পন্না ছিল। সে সর্বদা পঞ্চশীল পালন করতেন, দান দিতেন, সংঘের সেবা-পূজা করতেন এবং নারী জন্মের প্রতি বিতরাগ হয়ে পুরুষ জন্মকে প্রশংসা করতেন এবং পুরুষ-জন্ম প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করতেন। যখন শাক্য কুমারী গোপিকা মৃত্যু বরন করলেন, তখন মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্রের সমকক্ষ হয়ে “গোপিকা দেবপুত্র” নামে আবির্ভূত হলেন তার দ্বিতীয় জন্মে। কাজেই উক্ত উদাহরণের দ্বারা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, নারীরা যদি পুরুষ জন্ম প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছুক হন এবং উল্লেখিত চারটি ধর্মকে যথাযতভাবে প্রতিপালন করেন, তা হলে সে নারীরা অবশ্যই পরজন্মে বা দ্বিতীয় জন্মে পুরুষ জন্ম লাভ করতে সক্ষম হবেন। আর যখন উত্তম পুরুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে, তখন যদি বুদ্ধ হওয়ার জন্য পারমী সম্ভার পূরণ করে, তাহলে অবশ্যই নিজ পারমীর প্রভাবে অনাগতে বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হতে পারবে। একারণে বলা হয়েছে যে, নারীরাও বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

দানের পাঁচটি সুফল

প্রত্যেক জ্ঞানী লোকই দীর্ঘজীবী হওয়ার, সুখী বা সুন্দর বর্ণের অধিকারী হওয়ার, সুখী হওয়ার, ভালো সহচর্য লাভ করার এবং যশ-খ্যাতির অধিকারী হওয়ার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন। তথাপি যদি তাদের পূর্ব জন্মের দানের পুণ্য ফল না থাকে তা হলে তা কামনা করা সত্ত্বেও তারা ইহ জীবনে সে পাঁচটি সুফল লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র যাদের দানের পুণ্য ফল থাকে তারাই সেগুলো লাভ করতে সক্ষম হন। একদা কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে একই আবাসে দু'জন ভিক্ষু বাস করতেন। তখন তাদের দু'জনের মধ্যে দান সংক্রান্ত বিষয়ে একটা তর্ক-বিতর্ক উৎপন্ন হল। এক ভিক্ষু অপর ভিক্ষুকে বললেন - “আবুসো! তুমি পিণ্ডচরন করে আসার পর তোমাকে সর্ব প্রথম অন্য ভিক্ষুদেরকে আহার দান করা উচিত। কেননা এরূপ ভাগাভাগি করাকে ‘সারানীয বা স্বরগীয় ধর্ম’ বলা হয় যা আমাদের আচরণ করা দরকার আর দান দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ নিজে পরিভোগ করা কর্তব্য।” অতপরঃ অপর ভিক্ষু সে ভিক্ষুকে যুক্তি দিয়ে বললেন - “আবুসো! পিণ্ডচরণ কালে নিজের মাত্রাতিরিক্ত আহার গ্রহণ করা অনুচিত। কেবলমাত্র নিজের পরিমাণ মত আহার গ্রহণ করা দরকার। আর এরূপ আচরণ করাকে ‘ভাণ্ডগ্গবত্ত বা আহারজ্ঞ ব্রত’ বলে - যা আমাদের পালন করা উচিত এবং সে আহার অন্যকে দান দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।” এভাবে দু'জনে বাদানুবাদ করার পর একে অপরের যুক্তি কেউ গ্রহণ করতে পারল না। পরবর্তীতে তারা উভয়ে যে যার ব্রত ধর্ম পালন করতে লাগল। যখন তারা মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তারা উভয়ে দেব লোকে দেবপুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন। তারপর গৌতম বুদ্ধের সময়কালে সে দু'জন দেবপুত্র দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে শ্রাবস্তীতে একই দিনে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করলেন। তাদের দু'জনের মধ্যে যে স্বরগীয় ধর্ম পালন করতেন এবং দান দিতেন সে কোসল রাজার অগ্রমহর্ষীর পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন আর যে দান দিত না এবং ভাণ্ডগ্গবত্ত পালন করত, সে রাণীর দাসীর পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। একদা তাদের নাম করণ দিবসে যখন একে অপরকে

দর্শন করলেন তখন রাজ কুমার দাসীর পুত্রকে বললেন - “দেখ! আমি উত্তম বস্ত্র ও শ্বেতছত্রের নিচে উন্নত আরাম দায়ক বিছানায় শুয়ে আছি আর তোমার বিছানা ও আশাক-পোশাক অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের - তা নয় কি? এটা হয়েছে কেবলমাত্র তোমার কর্মের কারণে। কারণ তুমি ত স্বর্ণীয় ধর্ম পালন করতে না আর দান দিতে না। ইহার ফলে আজ তোমাকে একরূপ নিকৃষ্ট আশাক-পোশাক ও বিছানায় শয়ন করতে হচ্ছে” এই বলে তাকে ভৎসনা ও দোষারোপ করলেন। যখন রাণী সুমনা সে দু’জন বালকের আলাপচারিতা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিভূত হলেন। অতঃপর রাণী সুমনা বুদ্ধের নিকট গমন পূর্বক এভাবে বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন - “হে বুদ্ধ! যদি আপনার শাসন সন্ধর্মে দু’জন ভিক্ষু সমশ্রদ্ধা, সমশীল ও সমপ্রজ্ঞা নিয়ে অবস্থান করে, যদিও বা তারা উভয়ে সমান মাপকাঠিতে বিরাজমান; কিন্তু তাদের দু’জনের মধ্যে একজন দান করে আর অন্যজন দান করে না এবং মৃত্যুর পর উভয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হন; এক্ষেত্রে তারা উভয়ে কি সমান সুফল লাভ করবে নাকি ভিন্নতা প্রাপ্ত হবে?”

উত্তরে বুদ্ধ বললেন - হে সুমনা! তারা কখনে সমান সুফল লাভ করতে পারবে না। যে দান কার্য সম্পাদন করেছে, সে এই পাঁচটি সুফল করবে। সেগুলো হলঃ

১. দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হবে
২. সু-বর্ণের অধিকারী হবে
৩. ধনী ও সুখের অধিকারী হবে
৪. সৎ সহচর্য ও সেবক সেবিকা লাভ করবে
৫. যশবান ও ক্ষমতাশালী হবে

সেজন্য যে দান কার্য সম্পাদন করবে, সে দেবলোকেও উক্ত পাঁচটি সুফল লাভ করে থাকে আর যে দান কার্য সম্পাদন করে না সে পাঁচটি সুফল লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। অতপর রাণী সুমনা পুনঃরায় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন “হে বুদ্ধ! আর যদি সে দুই দেবপুত্র দেবলোক থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে তারা কি তখন উভয়ে সমান সুফল লাভ করবে নাকি ভিন্নতা প্রাপ্ত হবে?” সুমনার প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধ বললেন “হে সুমনা, তারা

দু'জনে কখনো সমান সুফল লাভ করবে না। যে দান কার্য সম্পাদন করেছিল, সে মনুষ্য লোকেও পাঁচটি সুফল লাভ করবে।” সে গুলো হলঃ

১. দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হবেন
২. সু-বর্ণের অধিকারী হবে
৩. ধনী ও সুখের অধিকারী হবে
৪. সৎ সহচর্য ও সেবক সেবিকা লাভ করবে
৫. যশবান ও ক্ষমতাশালী হবে

সেজন্য যে দান কার্য সম্পাদন করবে, সে মনুষ্য লোকেও উক্ত পাঁচটি সুফল লাভ করে থাকে আর যে দান কার্য সম্পাদন করে না, সে পাঁচটি সুফল করা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। রাণী সুমনা পুনঃরায় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন - “হে বুদ্ধ, যখন সে দু'জন ব্যক্তি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য জীবন পালন করার উদ্দেশ্যে আপনার শাসন সন্ধর্মে ভিক্ষু হন, তখন তারা কি উভয়ে সমান সুফল লাভ করবে নাকি ভিন্নতা প্রাপ্ত হবে?”

তারপর বুদ্ধ বললেন “হে সুমনা, সে দু'জন ব্যক্তি যদি আমার শাসনে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করলেও তারা উভয়ে সমান সুফল লাভ করতে সক্ষম হবে না। যে দান কার্য সম্পাদন করেছে, সে ভিক্ষুগণের প্রয়োজনীয় পাঁচটি বস্তু অধিক পরিমাণে লাভ করবে।” সেগুলো হলঃ

১. অধিক চীবর লাভ করবে
২. অধিক ভোজনাহার লাভ করবে
৩. অধিক বিহার বা আবাস লাভ করবে
৪. অতিরিক্ত ঔষধ-প্রত্যয় লাভ করবে
৫. অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করবে

যে দান কার্য সম্পাদন করেনি, তার চাইতে অধিক পরিমাণে উক্ত পাঁচটি সুফল লাভ করবে যে দান কার্য সম্পাদন করেছে। তারপর রাণী সুমনা পুনঃরায় বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন “হে বুদ্ধ, সে দু'জন ভিক্ষু যদি ভাবনা অনুশীলন করে অরহত্ত্ব ফল লাভ করে, তখন কি তারা উভয়ে সমান সুফল লাভ করবে না কি ভিন্নতা প্রাপ্ত হবে?”

তখন বুদ্ধ উত্তর দিলেন - “হে সুমনা, যখন তারা উভয়ে অরহত্ত্ব ফল লাভ করবে, তখন তারা সম্পূর্ণরূপে ক্লেশ সমূহ হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং সমান সুফল লাভ করে থাকে। কাজেই এক্ষেত্রে কোন ভিন্নতা নেই, উভয়ে সমফল লাভী।” বুদ্ধ কর্তৃক এরূপ সারগর্ভ ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে রাণী সুমনা অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়ে বললেন হে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ, অদ্যই আমি এরূপ অশ্রুতপূর্ব ধর্ম দেশনা শ্রবণ করলাম; এর পূর্বে আমি কখনো এরূপ ধর্ম দেশনা শ্রবণ করিনি। দানের পুণ্যফল মনুষ্য তথা দেবগণের কতই না উপকারী! সেজন্য প্রত্যেকে জীবদ্দশায় দান কার্য করা সম্পাদন করা নিতান্তই দরকার। অতপর বুদ্ধ রাণী সুমনার কথায় প্রদীপ্ত হয়ে বললেন - হ্যাঁ সুমনা! ইহাই সত্য, ইহাই উত্তম যে, ব্যক্তির জীবদ্দশায় অবশ্যই দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উচিত।

স্বপ্ন এবং তার কারণ

অরহত ব্যতীত সকলেইর স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই স্বপ্ন কখনো ভালরূপে আর কখনো কখনো খারাপ রূপে দৃষ্ট হয়ে থাকে। যখন কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে তখন সে অনেক আনন্দিত হয়ে থাকে এবং চিন্তা করে যে, তার অনেক মঙ্গল সাধিত হবে। পক্ষান্তরে যখন সে খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন সে খুবই দুর্মনা ও দুঃখী হয়ে থাকে এবং ভাবে যে, তার বোধ হয় অনেক অমঙ্গলের মুখোমুখি হতে হবে ইত্যাদি। যখন এরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হয় তখন মানুষের মন স্বপ্নের মূল তাৎপর্য জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। তখন স্বপ্নের মূল তাৎপর্য সম্পর্কে জানার জন্য যাদের স্বপ্ন সম্বন্ধে লক্ষণ-জ্ঞান আছে এরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও জ্যোতির্ষীগণের নিকট গমন পূর্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে থাকে। পূর্বে বুদ্ধের মাতা মহামায়া, বোধিসত্ত্ব ও কোশলরাজা প্রসেনজিৎ এর দ্বারা যে যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল, সে সে স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে লক্ষণ বিদ্যায় পারদর্শী ব্রহ্মগণ ও মহা জ্ঞানী বুদ্ধ স্বয়ং এর যথাযথ বিবরণ দিয়েছিলেন সুদূর ভবিষ্যতে মঙ্গল ও অমঙ্গল বিষয়াদি নিয়ে। বর্তমান কালে স্বপ্নের মূল তাৎপর্য ও পরিণাম সম্বন্ধে আমাদেরকে যথাযতভাবে বিবরণ দিতে পারে, সেরূপ ব্যক্তির যথেষ্ট দূর্লভ্যতা লক্ষণীয়। তবে এখন আমরা কিছু কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করে স্বপ্নের তাৎপর্য ও মঙ্গল এবং অমঙ্গল বিষয়াদি সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে পারি। অর্থকথাচার্যগণের মতে স্বপ্ন দৃষ্ট হওয়ার চারটি কারণ বিদ্যমান যা অঙ্গুত্তর নিকায় পঞ্চম নিপাতে মহাসুপিন সূত্র বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ধাতুক্খোভতো - ধাতু ক্ষোভের কারণে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে।
২. অনুভূতপুস্বতো - অনুভূতপূর্ব বিষয়াদির কারণে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে।
৩. দেবাতোপসংহারতো - দেবতাগণের কারণে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে।
৪. পুস্বনিমিত্ততো - পূর্বনিমিত্তের কারণে বা ভবিষ্যতে মঙ্গল ও অমঙ্গল বিষয়াদি বশে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে।

ক) ধাতুক্খোভতো বা ধাতু ক্ষোভের কারণে স্বপ্ন বলতে - যখন রূপ

কায়ের চতুর্বিধ ধাতু (পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ু ধাতু) ও পিত্তাদি ক্ষুদ্র-বিক্ষুদ্র বা গড়বড় হয়ে যায়, তখন লোকের ভয়পূর্ণ বা ভীতিকর স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমনঃ সুউচ্চ পর্বত থেকে নিচে পতিত হওয়া, আকাশে উড়তে উড়তে হঠাৎ করে নিম্নে পড়ে যাওয়া, হিংস্র বাঘ, ভালুক, হাতি, ঘোড়া, গরু-মহিষ সহ ইত্যাদি জীবজন্তু এবং চোর ডাকাত হতে ধাওয়া খেয়ে ভীত ও ভয়ানক হওয়া ইত্যাদি। এই জাতীয় স্বপ্নগুলো মূলত ধাতুর প্রকোপতার কারণেই দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই স্বপ্ন গুলো ভবিষ্যতে কখনো সত্যও হয় না আর ফলপ্রসূও হয়না।

খ) অনুভূত পুঙ্খতো বা অনুভূত পূর্বের কারণে স্বপ্ন বলতে - এটা মূলত পূর্বে আমাদের দ্বারা অনুভূত হয়েছে এমন কিছু সুন্দর-অসুন্দর, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়াদির কারণে এই জাতীয় স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমনঃ পূর্বে দান দিতে, পঙ্কশীল বা অষ্টশীল গ্রহণ করতে, ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে ভাবনা অনুশীলন করতে অথবা নানাবিধ মঙ্গলজনক, প্রীতিকর ও মনোরম দৃশ্য দর্শন করতে আর অন্যদিকে প্রাণী হত্যা করতে, দণ্ডসংঘাত করতে, দুভোগ করতে অথবা নানা প্রকারের অমঙ্গল জনক ও অপ্ৰীতিকর বিষয়াদি স্বপ্নে দৃষ্ট হয়ে থাকে। মূলতঃ এই জাতীয় স্বপ্নগুলো ত্রি-দ্বারে অনুভূতপূর্ব বিষয়াদি পুনঃস্মরণ মাত্র। সেহেতু এই প্রকারের স্বপ্নগুলো ভবিষ্যতে কোন প্রকারে সত্য বা ফলপ্রসূ হয় না।

(গ) দেবতোপসংহারতো বা দেবতাদের কারণে স্বপ্ন বলতে - অনেক সময় দেবতারা মনুষ্যদের প্রতি প্রীত বা আনন্দিত হয়ে নিজেদের প্রভাবে মঙ্গলজনক স্বপ্ন দেখিয়ে থাকেন। আর অন্যপক্ষে দেবতারা মনুষ্যদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েও নিজেদের প্রভাবে অমঙ্গলজনক স্বপ্ন দেখিয়ে থাকেন। এরূপ দেবতাদের প্রভাবে দৃষ্ট স্বপ্ন ভবিষ্যতে মঙ্গল অথবা অমঙ্গল উভয় প্রকার ফল প্রসূ হতে পারে। আর দেবতাদের কর্তৃক প্রেম ও ক্রোধের বশে যে স্বপ্নগুলো দৃষ্ট হয়, সেগুলো মাঝে মাঝে সত্যও হতে পারে আর মিথ্যাও হতে পারে। দেবতারা যদি প্রেম বা প্রীতির বশে স্বপ্ন দেখায় তাহলে তা সত্য হয় আর যদি হিংসা বা ক্রোধের বশে স্বপ্ন দেখায় তাহলে তা সত্য হয় না - কারণ এক্ষেত্রে দেবতারা বিপরীত করে স্বপ্ন দেখিয়ে থাকে। যদি কেউ এরূপ

স্বপ্নগুলোকে সত্য বা বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে বিপরীতভাবে তার অবশ্যই অমঙ্গল এবং অনর্থ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ একটা গল্প অবতারণা করা যাক। একদা লঙ্কাদ্বীপে নাগ বিহারবাসী এক মহাস্থবির ভিক্ষু সংঘকে জিজ্ঞাসা না করে একটি নাগেশ্বর বৃক্ষ ছেদন করেছিল। সে নাগেশ্বর বৃক্ষে অবস্থানকারী বৃক্ষ দেবতা তখন সে মহাস্থবিরের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলে তাকে প্রলোভিত করার জন্য একটি স্বপ্ন দেখিয়েছিল যা প্রথম বারের মত সত্য হয়েছিল। এই হেতু মহাস্থবির দেবতা কর্তৃক প্রদর্শিত স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ছিল। দ্বিতীয়বার যখন সে দেবতা স্বপ্নে মহাস্থবিরকে বললেন “এই হতে ছয় দিন পর সপ্তম দিবসে আপনার প্রধান দায়ক রাজার মৃত্যু হবে” তখন এই সংবাদ মহাস্থবির নগরে প্রবেশ করে তা নগরবাসীদেরকে ব্যক্ত করলেন। এই সংবাদ শুনা মাত্রই নগরবাসীদের ক্রন্দনের রোল পরে গেল। তখন রাজা - “তোমরা ক্রন্দন করিতেছ কেন” জিজ্ঞাসা করলে, নগরবাসীরা মহাস্থবিরের কথিতানুসারে সকল কথা খুলে বলল। সে হতে নগরবাসীরা আরো অধিক ক্রন্দন করতে লাগলেন আর রাজাও ভয়-ভীত হয়ে গণনা করতে করতে সাত দিন অতিবাহিত করলেন - কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল না। অতঃপর রাজা সাত দিন পর বলিলেন যে, মহাস্থবির মিথ্যা আগাম সংবাদ প্রচার করে সকলকে ভয়-ভীত করিয়ে কাঁদিয়েছে। সেহেতু রাজা দণ্ড স্বরূপ “মহাস্থবিরের হস্ত-পদ ছেদন করা হোক” বলে আদেশ দিলেন। আদিষ্ট হয়ে রাজ পুরুষগণের কর্তৃক মহাস্থবিরের হস্ত-পদ ছেদন করা হল। এভাবে দেবতা মহাস্থবিরের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বিপরীত স্বপ্ন দেখিয়ে ছিল এবং মহাস্থবির তা বিশ্বাস করার কারণে নিজে দুঃখে পতিত হয়েছিলেন।

(ঘ) পূর্বনিমিত্ততো বা পূর্ব নিমিত্তের কারণে স্বপ্ন বলতে - কুশলাকুশল কর্মের প্রভাবে ভাবী কালের আসন্ন মঙ্গলামঙ্গল বিষয়াদি নিয়ে নিমিত্তাকারে স্বপ্নে দৃষ্ট হয়ে থাকে। এরূপ পূর্ব নিমিত্তের বশে দৃষ্ট স্বপ্নাদি ভাবী কালে মঙ্গলামঙ্গলের ফলাফল অনিবার্য হয়ে থাকে। কাজেই যারা পূর্বনিমিত্ত বশে ইষ্ট (মঙ্গল) স্বপ্ন দর্শন করে, তাদের অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল সাধিত হবে আর যারা পূর্বনিমিত্ত বশে অনিষ্ট

(অমঙ্গল) স্বপ্ন দর্শন করে, তাদের অনিবার্য অমঙ্গল সাধিত হবে। সুতরাং পূর্ব নিমিত্তের বশে দৃষ্ট স্বপ্ন গুলো কখনো বিফল হয় না, ভবিষ্যতে অবশ্যই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। পূর্বনিমিত্ত বশে দৃষ্ট স্বপ্ন এই বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পূর্বনিমিত্তি স্বরূপ বোধিসত্ত্বের পঞ্চমহা স্বপ্নের অবতারণা করা হল।

১. প্রথম স্বপ্ন : রাত্রির তৃতীয় যামে বোধিসত্ত্ব স্বপ্নে এরূপ দর্শন করলেন, এই মহাপৃথিবী যেন তার বিছানার ন্যায়, হিমালয় পর্বত বালিশের ন্যায়, পূর্ব সমুদ্রে ডান হাত, পশ্চিম সমুদ্রে বাম হাত এবং দক্ষিণ সমুদ্রে পদদ্বয় স্থাপনের ন্যায় দৃষ্ট হয়েছিল। সেটা ছিল বোধিসত্ত্বের অনুত্তর সম্যক সম্বোধি জ্ঞান লাভের পূর্ব নিমিত্ত।

২. দ্বিতীয় স্বপ্ন : পুনঃরায় আরেক স্বপ্নে দর্শন করলেন, রক্তবর্ণ ডাটায়ুক্ত এক প্রকার তৃণ তার নাভিস্থল হতে এতই দ্রুতগতিতে বর্ধিত হতে লাগল যে, দেখতে দেখতেই বিঘত প্রমাণ, হস্ত প্রমাণ, ব্যাম প্রমাণ, যষ্টি (চারিহাত) প্রমাণ, গাবুত, অর্ধ যোজন ও যোজন প্রমাণ এই প্রকারে বদ্ধিত হতে হতে অনেক সহস্র যোজন তথা উচ্চ আকাশে পর্যন্ত গিয়ে বিকশিত হল। সেটা ছিল বোধিসত্ত্বের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে সুপ্রকাশিত হবার পূর্ব নিমিত্ত।

৩. তৃতীয় স্বপ্ন : পুনঃরায় আরেক স্বপ্নে দর্শন করলেন, কালো বর্ণ মাথা যুক্ত ও শ্বেতবর্ণের শরীর বিশিষ্ট এক প্রকার পোকা পাদ-পার্শ্ব দিক্ হতে উঠে জানুমণ্ডল পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছিল। সেটা ছিল বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব লাভের পর অসংখ্য শুভ্র বসনধারী গৃহী শিষ্যগণ বুদ্ধের সমীপে আগমন করতঃ তাঁর শরণ গ্রহণের পূর্বনিমিত্ত।

৪. চতুর্থ স্বপ্ন : পুনঃরায় দর্শন করলেন যে, নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেত বর্ণের চারটি পক্ষী চারদিক হতে উড়ে এসে বোধিসত্ত্বের পাদমূলে পতিত হয়ে নিখুঁত শ্বেত বর্ণের রূপ ধারণ করল। সেটা ছিল বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব লাভের পর ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মণাদি ভেদে চারি বর্ণের বা জাতির ভক্ত-বৃন্দ বুদ্ধের নিকট আগমন করে দেশিত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক নির্বাণ অধিগত করার পূর্ব নিমিত্ত।

৫. পঞ্চম স্বপ্ন : পরিশেষে আরো স্বপ্নে দর্শন করলেন যে, তিনি মহা

অশুচি পর্বতের উপরিভাগে দণ্ডায়মান অবস্থায় তৎসঙ্গে অসংলগ্নভাবে চংক্রমণ করছিলেন। ইহা ছিল বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব লাভের পর চীবর, শয়নাসনাদি চতুর্প্রত্যয় বহু পরিমাণে লাভ করলেও এতে অনাসক্ততার পূর্ব নিমিত্ত। উক্ত পঞ্চমহা স্বপ্ন সমূহ আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পক্ষের চতুর্দশী রাত্রির শেষ যামে বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব নিমিত্ত দর্শন করেছিলেন যা বুদ্ধত্ব লাভের পর সেগুলো যথাসত্য হয়েছিল। আমরা জানি যে, পূর্বে উল্লেখিত চারি কারণে দৃষ্ট স্বপ্ন সমূহ কেউ দর্শন করলে তার সত্য-মিথ্যা কেবলমাত্র সময়ের অনুপাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন কেউ যদি দিনের বেলায়, রাত্রির প্রথম ও দ্বিতীয় যামে স্বপ্ন দর্শন করে, তাহলে সে প্রকারের স্বপ্ন গুলোর কোন ফলপ্রসূ বা সত্য হয় না। কিন্তু রাত্রির শেষ যামে (দুইটা হতে ছয়টা পর্যন্ত সময়) দৃষ্ট গুলোতে অবশ্যই ইষ্ট স্বপ্নে ইষ্ট ফল আর অনিষ্ট স্বপ্নে অনিষ্ট ফল লাভ হয়ে থাকে। কাজেই ইহা মনে রাখতে হবে যে, ভোর বেলায় দৃষ্ট স্বপ্নগুলো অধিকাংশে সত্য হয়ে থাকে। উক্ত চার প্রকার স্বপ্ন গুলো কেবলমাত্র শৈক্ষ্য পুদ্রালেরা (পৃথকজন, শ্রোতাপন্ন, সঙ্কদাগামী ও অনাগামী) দর্শন করে থাকে। কিন্তু অরহতগণ কদাপি স্বপ্ন দর্শন করেন না।

শ্রোতাপন্ন পুঙ্গালেরা অপায়ে গমন করে না

সচরাচর ধর্ম-প্রাণ বৌদ্ধরা চারি অপায়ে (তির্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয়) জন্ম গ্রহণ করার অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে থাকে। সে হেতু তারা অপায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যথা সম্ভব দান, শীল ইত্যাদি পুণ্য কর্মাদি সম্পাদন করে থাকে। তারপরও পৃথকজনের এই দান, শীল এবং শমথ ভাবনা অনুশীলনের পুণ্যাদির দ্বারা চারি অপায়ের দরজাকে চিররুদ্ধ করা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। কেবলমাত্র শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফল লাভ করলেই চারি অপায়ের দরজা চিররুদ্ধ করা সম্ভব। সেহেতু শ্রোতাপন্ন পুঙ্গালেরা চারি অপায় হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। কাজেই যারা নিজেকে চারি অপায় হতে মুক্ত হতে ইচ্ছুক হন তাহলে তাদেরকে অবশ্যই বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করা দরকার। কারণ বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনই হচ্ছে শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফল লাভের সবচাইতে নিকটতম ঋজু ও অনুকূল পন্থা। যদি কেউ সঠিক উপায়ে বিদর্শন ভাবনা যথাভূতভাবে অনুশীলন করে তাহলে সে অবশ্যই নিজ প্রতিপদানুসারে (অনুশীলন করার উপর নির্ভর করে) শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফল লাভ করতে সক্ষম হবে। আর যখন সে শ্রোতাপন্ন মার্গ-ফল লাভ করবে তখনই তার চারি অপায়ের দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। এই প্রকারে পৃথকজন পুঙ্গালের গতি বিপত্তি এবং শ্রোতাপন্ন পুঙ্গালের গতি বিমুক্তিতা দর্শন পূর্বক অন্ততঃ ইহ জীবনে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা চারি অপায়ের দরজা চিররুদ্ধ করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা করা দরকার।

শ্রোতাপত্তি মার্গ লাভের চারটি সহায়ক ধর্ম

১. সঙ্ঘরিস সংসেবো - কল্যাণ মিত্রের সংশ্রব।
২. সদ্ধম্ম সবণং - মার্গানুকূল ধর্ম দেশনা শ্রবণ করা।
৩. যোনিসোমনসিকার - কুশল মনস্কার বা কুশল ধর্ম ও মার্গ ধর্মের দিকে চিন্তকে পরিচালিত করা।
৪. ধম্মানুধম্মপটিপত্তি - নবলোকুণ্ডর ধর্ম লাভের সহায়ক ধর্মাদি অনুশীলন করা।

(ক) সঙ্ঘুরিস সংসেবো - বুঝাতে যারা শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফল লাভ করতে খুবই ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই চারি স্মৃতি প্রস্থান বিদর্শন ভাবনা বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন কল্যাণ মিত্র গুরুর নিকট গমন পূর্বক কর্মস্থান শিক্ষা গ্রহণ করে ভাবনা অনুশীলন করা অথবা মার্গানুকূল ধর্ম শিক্ষা প্রদানে সক্ষম এরূপ কল্যাণ মিত্র গুরুর কাছ থেকে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতঃ যতদিন মার্গ-ফল লাভ না করে ততদিন পর্যন্ত কল্যাণ মিত্র গুরুর সান্নিধ্যে অবস্থান করা। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা মার্গ-ফল লাভ করতে ইচ্ছুক তথা অন্তত শ্রোতাপন্ন হতে চান তাদেরকে অবশ্যই এরূপ গুণ সম্পন্ন কল্যাণ মিত্র গুরুর কাছ হতে মার্গানুকূল ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যেমনঃ সমস্ত ক্লেশক্ষয়কারী, জন্ম নিরোধকারী এবং নির্বাণ অধিগতকারী অরহতের কাছ হতে মার্গানুকূল ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যদি অরহতের সন্ধান লাভ না হয়, তাহলে অনাগামীর নিকট গমন করতে হবে। যদি অনাগামীর সন্ধান লাভ না হয়, তাহলে সকৃদাগামীর নিকট গমন করতে হবে। যদি সকৃদাগামীর সন্ধান লাভ না হয়, তাহলে শ্রোতাপন্নের নিকট গমন করতে হবে। যদি শ্রোতাপন্নের সন্ধান লাভ না হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপিটকধারী, দ্বি-পিটকধারী অথবা এক-পিটকধারী পুঙ্গলের নিকট গমন করতে হবে। যদি তাও লাভ না হয়, তাহলে অবশ্যই এমন এক জনের কাছে যেতে হবে যে নিজেই চারি স্মৃতি প্রস্থান বিদর্শন ভাবনা চর্চা করে এবং অন্যদেরকেও স্মৃতি প্রস্থান বিদর্শন ভাবনা বিষয়ে যথাভূতভাবে ও পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে শিক্ষা প্রদান করতে পারে। বুদ্ধের সমকালীন সময়ে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রয়েছে যারা কল্যাণ মিত্রের সন্ধান না করে এবং মার্গানুকূল ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ না করে মার্গ-ফল লাভ করা হতে বঞ্চিত হয়েছিল। আর যারা কল্যাণ মিত্রের সন্ধান করে এবং তাদের কাছ হতে মার্গানুকূল ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করে তারা মার্গ-ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

একদা বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিল। তখন শ্রাবস্তীর এক জনৈক স্বর্ণকার সারিপুত্র ভাস্তের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক ভাস্তের নির্দেশনায় সে অশুভ ভাবনা অনুশীলন করতে লাগলেন। তিনমাস অবধি অশুভ ভাবনা অনুশীলন করার পরও সে কোন মতেই

চিত্তকে সমাধিস্থ ও মার্গ ফল লাভ করতে পারল না। ফলে সে সারিপুত্র ভাস্তের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সারিপুত্র ভাস্তে চিন্তা করলেন যে, ভিক্ষুটি যেহেতু যুবক ও সুদর্শন সেহেতু তিনি পুনরায় একই অশুভ ভাবনার কর্মস্থান প্রদান করে তা অনুশীলন করার জন্য তাকে প্রেরণ করলেন। পরবর্তীতে যখন সে যুবক ভিক্ষু কোন মার্গ ফল লাভ না করে তৃতীয় বারের মত ফিরে আসল তখন “কেবলমাত্র বুদ্ধই একে যথার্থ কর্মস্থান ভাবনা প্রদান করতে পারবেন” এই চিন্তা করে সারিপুত্র ভাস্তে তাকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করলেন। বুদ্ধ তাকে দর্শন করে জানতে পারলেন যে, “এই স্বর্ণকারের পুত্র অতীতে পাঁচশত জন্ম পর্যন্ত স্বর্ণকার হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছিল। সেহেতু সে কেবলমাত্র স্বর্ণের উপরই নিজের চিত্তকে সমাহিত ও সমাধিস্থ করতে সক্ষম হবে” এই ভেবে বুদ্ধ ঋদ্ধির দ্বারা একটি স্বর্ণ বর্ণের পদ্মফুল তৈরী করে তাকে প্রদান করলেন এবং তাতে কর্মস্থান ভাবনা অনুশীলন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। উপযুক্ত কর্মস্থান প্রাপ্ত হয়ে সে ভিক্ষুটি খুব দ্রুত গতিতে চতুর্থ ধ্যান লাভ করলে তখন বুদ্ধ তাকে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুটি অচিরেই ক্রমগতিতে ধাপে ধাপে শ্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত্ত্ব মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সে কারণে বলা হয়েছে, যারা মার্গ-ফল তথা অন্ততঃ শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফল লাভ করতে ইচ্ছুক তাহলে তাদেরকে অবশ্যই কল্যাণ মিত্র গুরুর সংস্রব লাভ করতে হবে।

(খ) সদ্ধম্ম স্রবণং - বুঝাতে যারা শ্রোতাপন্ন হতে ইচ্ছুক তা হলে তাদেরকে অবশ্যই মার্গ-ফল লাভের অনুকূল বা সহায়ক এরূপ স্মৃতি প্রস্থান বিদর্শন ভাবনা মূলক ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে হবে। যারা এরূপ মার্কানুকূল ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে, তারা অবশ্যই নিজেদের পারমী ও প্রতিপদানুসারে শ্রোতাপত্তি, স্কৃদাগামী মার্গ-ফলাদি লাভ করতে সক্ষম হবে। বুদ্ধের সময়ে অনেক লোকের দৃষ্টান্ত ছিল যারা ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার কালে শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফলাদি লাভ করেছিল। যখন বুদ্ধ শ্রাবস্তী জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন, তখন অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর পুত্র কাল অত্যন্ত দুর্বিনীত, অশান্ত ও পাপাচারে রত ছিল। একদা শ্রেষ্ঠী চিন্তা করলেন - “আমার পুত্র যদি এভাবে

পাপে রত থাকে, তাহলে সে নিশ্চয় অপায়ে গমন করবে। কাজেই পুত্রের অপায় গমন রোধ করার একটা ব্যবস্থা করা দরকার” এভাবে তিনি পুত্রকে ডেকে বললেন, “পুত্র, যদি তুমি অষ্টশীল গ্রহণ পূর্বক জেতবনে গমন করে বুদ্ধের দেশিত একটি চতুষ্পদী গাথা রপ্ত করতঃ সেখান থেকে এসে আমাকে সে গাথা বলতে পার তাহলে তোমাকে এক হাজার মুদ্রা প্রদান করব” এরূপ বলা হলে কাল এক হাজার মুদ্রার লোভে রাজী হয়ে গেল এবং বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার জন্য সে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে গমন করল। অতপর বুদ্ধ তার হেতু সম্পদ (মার্গ-ফল লাভের উপনিশ্রয় হেতু) দর্শন করতঃ ধর্ম দেশনা করার কালে এমন ঋদ্ধি প্রয়োগ করলেন যাতে কাল কোন মতে গাথা রপ্ত করতে না পারে। এভাবে বুদ্ধ ধর্ম দেশনা প্রদান সময়ে কাল যখন কোন একটি গাথা রপ্ত করতে চাইত তখন বুদ্ধ আরো একটি প্রসঙ্গে ধর্ম দেশনায় চলে যেতেন। আর যখন কাল পুনরায় সেটি রপ্ত করতে চেষ্টা করত তখন বুদ্ধ আরো অন্য একটি দেশনায় চলে যেতেন। এভাবে কাল অতি প্রচেষ্টা ও মনযোগের সহিত ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে করতে শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সে হেতু যারা মার্গ-ফলাদি লাভ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই মার্গানুকূল ধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে হবে।

(গ) যোনিসোমনসিকার - বুঝাতে কুশল বা সম্যক মনস্কারকেই বুঝাই। এই কুশল মনস্কারই কুশল কর্ম সম্পাদনের প্রতি এবং মার্গ-ফল তথা নির্বাণ লাভের ক্ষেত্রে শোভন (কুশল) চৈতসিক ও চিত্ত সমূহকে যথাভূতভাবে পরিচালনা করে থাকে। সারথি যেমন অতীব মনযোগের সাথে প্রশিক্ষিত দু’অশ্বকে সম-প্রদক্ষেপে গন্তব্য স্থানে চালনা করে, ঠিক তদ্রূপভাবে যোনিসোমনসিকারও শোভন চৈতসিক এবং কুশল চিত্ত সমূহকে কুশল কর্ম সম্পাদনের প্রতি এবং মার্গ-ফল তথা নির্বাণ লাভের ক্ষেত্রে যথাযতভাবে পরিচালনা করে থাকে।

(ঘ) ধম্মানুধম্ম পটিপত্তি - বলতে যারা মার্গ-ফলাদি লাভ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই নবলোকুণ্ডর ধর্ম লাভের সহায়ক ধর্মাদিকে অনুশীলন করতে হবে। যেমনঃ কেউ দান করলে, শীল প্রতিপালন

করলে এবং ভাবনাদি অনুশীলন করলে এক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য বা চেতনা কেবলমাত্র মার্গ-ফল ও নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে সম্পাদন করতে হবে। কাজেই যারা মার্গ-ফল তথা অন্তত শ্রোতাপন্ন হতে চাই তাদেরকে অবশ্যই বিবর্ত পুণ্য সম্পাদন করতে হবে (যে পুণ্য নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন করে) ও বিদর্শন ভাবনাদি অনুশীলন করতে হবে।

শ্রোতাপন্ন পুদালের ছয়টি গুণ ধর্ম

১. সঙ্কম্মনীয়তো - শ্রোতাপন্ন পুদালগণ সর্বদা ধর্মে নিরত ও স্থিত থাকেন।
২. অপরিহান ধম্মো - শ্রোতাপন্ন পুদালগণের কখনো ধর্মের পরিহানী হয় না।
৩. পরিযন্তকতা দুক্ক - শ্রোতাপন্ন পুদালগণের দুঃখ পরিভোগের সময় সীমা নির্দ্ধারিত হয়।
৪. অসাধারণঞানো - শ্রোতাপন্ন পুদালগণ অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হন।
৫. হেতু চ সুদিট্টো - শ্রোতাপন্ন পুদালগণ হেতু আদি বিষয়ে যথাযতভাবে পরিজ্ঞাত হন।
৬. হেতুসমুপ্পন্না চ ধম্মো - শ্রোতাপন্নগণ হেতু সমুৎপন্ন বা হেতু প্রত্যয়ে উৎপন্ন ধর্মাদি বিষয়ে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হন।

(ক) সঙ্কম্মনীয়তো - বলতে একজন শ্রোতাপন্ন পুদাল কুশল ধর্ম আচরণে বা অনুশীলনে তিনি সদা সর্বদা অবিচল, অটুট এবং স্থির থাকেন। শ্রোতাপন্নরা সর্বদা কুশল কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত হয়ে থাকেন। যেমনঃ এক জন শ্রোতাপন্ন তিনি কখনো প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যা কথা বলা এবং নেশাদ্রব্য সেবন করেন না অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই পঞ্চাশীল লঙ্গন করেন না এবং এতে সে অবিচল থাকেন। কোন শত্রু ভাবাপন্ন লোক যদি তাকে মৃত্যুর ভয় প্রদর্শন করিয়ে প্রাণী হত্যাদি পঞ্চাশীল লঙ্গন করতে এবং স্বধর্ম ত্যাগ করতে হুমকি দেয় এমতাবস্থায়ও প্রয়োজনে সে প্রাণ ত্যাগ করবে, তথাপি সে পঞ্চাশীল তথা স্বধর্ম ত্যাগ করবে না। এভাবেই শ্রোতাপন্ন

পুণ্ডালেরা স্বধর্মে স্থির, নিরত ও অবিচল শ্রদ্ধায় ধর্মাচারেণ প্রতিপন্ন হয়ে অবস্থান করে থাকেন।

(খ) অপরিহান ধম্মো- বলতে কেউ শ্রোতাপন্ন হওয়ার পর থেকে তার নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত সপ্ত আৰ্যধনের (শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুত, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা) কোন পরিহানি হয় না বরং দিন দিন বৃদ্ধি অভিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। একজন পৃথকজন পুণ্ডাল সে শ্রদ্ধা, শীলাদি সপ্ত আৰ্য ধন সমূহকে রক্ষা করলেও তা জীবন প্রবর্তন কালে কোন না কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তা ভঙ্গ হতে পারে। কিন্তু শ্রোতাপন্ন পুণ্ডালের সে সপ্ত আৰ্য ধনাদি কোন মতে বা কোন পরিস্থিতিতেও ইহ জীবন তথা ভবিষ্যত জন্মে তা ভঙ্গ হওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু সে গুলো ক্রমান্বয়ে অভিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। শ্রোতাপন্ন পুণ্ডালেরা সপ্ত আৰ্য ধন সমূহকে এমনভাবে রক্ষা করে থাকেন যাতে এর একান্ত সহায়তায় পরবর্তীতে উচ্চতর মার্গ ফলাদি লাভ করা যায়। এহেতু শ্রোতাপন্ন পুণ্ডালের সপ্ত আৰ্য ধন ধর্মের কোন পরিহানি হয় না।

(গ) পরিযন্তকতা দুঃখ - বুঝাতে যারা শ্রোতাপন্ন হন তাদের জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ এবং মরণ দুঃখ সহ পঞ্চস্কন্ধের সকল দুঃখরাশি সাত জন্মের অধিক পরিভোগ করেন না। কারণ শ্রোতাপন্নরা মনুষ্যলোক তথা দেবলোকে সাত জন্মের মধ্যেই নির্বাণ লাভ করে থাকেন সে হেতু বলা হয়েছে “পরিযন্তকত দুঃখং” অর্থাৎ শ্রোতাপন্ন পুণ্ডালের অপায়ের দুঃখ নিঃশেষ এবং জরা, মরণাদি পঞ্চস্কন্ধের দুঃখ পরিভোগের সময় সীমা নির্দ্ধারিত। একদা বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করার কালে বুদ্ধ নিজ নখাঞ্জে কিছু পরিমাণ মাটি স্থাপন করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমার নখাঞ্জে স্থিত মাটি অধিক না কি পৃথিবীতে স্থিত মাটি অধিক?” বুদ্ধ কর্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভিক্ষুগণ বললেন “হে বুদ্ধ, পৃথিবীতে স্থিত মাটির তুলনায় আপনার নখাঞ্জে স্থিত মাটি তা অতীব সামান্য ও নগণ্য।” অতপর বুদ্ধ বললেন “হে ভিক্ষুগণ, জরা, ব্যাধি এবং মরণাদির দুঃখ সাত জন্মের অধিক পরিভোগ করে না এই ধরনের পুণ্ডালের সংখ্যা আমার নখাঞ্জে স্থিত মাটির ন্যায় অতীব সামান্য ও অল্প আর সংসারে শ্রোতাপত্তি মার্গ ফলাদি লাভ না করে অন্তহীন জরা, ব্যাধি ও মরণাদির দুঃখ পরিভোগ

করছে এই ধরনের পুদ্রালের সংখ্যা পৃথিবীতে স্থিত মাটির ন্যায় অগণীত এবং অসংখ্য। বুদ্ধ এভাবেই শ্রোতাপন্থদের দুঃখ পরিভোগের সময় সীমা বর্ণনা করেছিলেন।

(ঘ) অসাধারণজ্ঞানো - একজন শ্রোতাপন্থ একজন পৃথক জন হতে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। যেমনঃ একজন পৃথকজন পুদ্রাল সে মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ ও চারি অপায়ে জন্ম গ্রহণকারী অতিলোভ, অতিদেষ্ট এবং অতিমোহ আদি ত্যাগ বা প্রহাণ করে নাই। এহেতু সে অনিত্যকে নিত্যরূপে, দুঃখকে সুখরূপে এবং অনাত্মকে আত্মরূপে ধারণা করে থাকে। অপরপক্ষে যিনি শ্রোতাপন্থ হয়েছেন, তিনি মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ এবং অপায়ে জন্ম গ্রহণকারী অতিলোভ, অতিদেষ্ট এবং অতিমোহ সমূহকে সমূলে প্রহাণ করে থাকেন। সে অনিত্যকে অনিত্যরূপে, দুঃখকে দুঃখরূপে এবং অনাত্মকে অনাত্মরূপে জ্ঞাত হয়ে থাকেন এবং তার লৌকিক ও লোকুত্তর ধর্মাদি বিষয়ে বিশেষ বা অসাধারণ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে যা একজন পৃথক জনের নিকট কোন প্রকারেই থাকেনা।

(ঙ) হেতু চ সুদিট্টো - বুঝাতে একজন শ্রোতাপন্থ তিনি কিসের কারণে কুশল হয় এবং কিসের কারণে অকুশল হয় এই উভয় ধর্মের প্রকৃত হেতু বা কারণ সম্পর্কে যথাভূতভাবে জ্ঞাত হয়ে থাকেন। যেমনঃ একজন শ্রোতাপন্থ ত্রিধারের কোন্ কোন্ কায়কর্ম, বাক্যকর্ম এবং মনকর্ম কুশল ও অকুশল হবে তা তিনি যথাযতভাবে জানেন। তা ছাড়াও কি কি কর্ম সম্পাদন করলে তা সুখের কারণ হয় আর কি কি কর্ম সম্পাদন করলে তা দুঃখের কারণ তা তিনি প্রকৃষ্টরূপে অবগত হয়ে থাকেন।

(চ) হেতুসমুপ্পন্না চ ধম্মো - বুঝাতে একজন শ্রোতাপন্থ পুদ্রাল হেতু সমুৎপন্ন ধর্ম বা কার্য-কারণে ফলোৎপন্ন ধর্ম বিষয়ে যথাভূতভাবে জানতে পারেন। যেমনঃ কুশল কর্মের কারণে সুখ লাভ হয় এবং অকুশল কর্মের কারণে দুঃখ লাভ হয় অথবা চক্ষু এবং রূপ এই দুয়ের স্পর্শের কারণে চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, চক্ষু বিজ্ঞানের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে

উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জাতি, জাতির কারণে জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিতাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপায়াসাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে ইত্যাদি।

পৃথকজন এবং শ্রোতাপন্নের পার্থক্য

পৃথকজন এবং শ্রোতাপন্ন এই দু'পুন্ডালের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্যতা লক্ষণীয়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং একজন মূর্থ ব্যক্তির যেরূপ পার্থক্যতা পরিলক্ষিত হয় ঠিক সেরূপে একজন শ্রোতাপন্ন এবং একজন পৃথকজন লোকের মধ্যে সে ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। তা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

ক. শ্রোতাপন্ন পুন্ডাল

১. সৎকায় দৃষ্টি প্রহাণ হয়
২. বিচিকিৎসা প্রহাণ হয়
৩. শীলব্রত পরামর্শ প্রহাণ হয়
৪. অতিলোভ প্রহাণ হয়
৫. অতিদ্বेष প্রহাণ হয়
৬. অতিমোহ প্রহাণ হয়
৭. পঞ্চশীল লঙ্গন করে না
৮. অপায়ের দরজা চিররুদ্ধ
৯. সুগতি নিশ্চিত
১০. দুঃখ পরিভোগের সীমা নির্দ্ধারিত
১১. নির্বাণ লাভ নিশ্চিত

খ. পৃথকজন পুন্ডাল

১. সৎকায় দৃষ্টি বিদ্যমান
২. বিচিকিৎসা বিদ্যমান
৩. শীলব্রত পরামর্শ বিদ্যমান
৪. অতিলোভ বিদ্যমান
৫. অতিদ্বেষ বিদ্যমান
৬. অতিমোহ বিদ্যমান
৭. পঞ্চশীল লঙ্গন করে
৮. অপায়ের দরজা খোলা
৯. সুগতি অনিশ্চিত
১০. দুঃখ পরিভোগের সীমা অনির্দ্ধারিত
১১. নির্বাণ লাভ অনিশ্চিত

উপরোক্ত পৃথকজন এবং শ্রোতাপন্ন পুন্ডালদ্বয়ের পার্থক্য সমূহ আরো সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়ার জন্য নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা করা হল।

ক) পৃথকজনেরা নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের ইহা রূপ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংস্কার এবং ইহা বিজ্ঞান এই নাম-রূপের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয় না। যার কারণে তারা পঞ্চস্কন্ধকে আমি, আমার, নিত্য, সুখ, আত্ম মূলক বিপ্রলাস যুক্ত হয়ে তাদের সৎকায় দৃষ্টি উৎপন্ন হয়ে থাকে। যদিওবা একজন পৃথকজন শ্রুতময় ও চিন্তাময় জ্ঞানের দ্বারা নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধাদির পার্থক্য অগভীরভাবে বা যৎ কিঞ্চিৎভাবে বুঝতে পারে, তথাপি সেই জ্ঞান দিয়ে সৎকায় দৃষ্টিকে সমূলে প্রহাণ করা অসম্ভব। যার ফলে তাদের নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের প্রতি বিপ্রলাস যুক্ত হয়ে পরবর্তীতে ইহা আমি, আমার, নিত্য, সুখ ও আত্ম আদি দৃষ্টি উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু একজন শ্রোতাপন্নের নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের প্রতি ইহা আমি, আমার, নিত্য, সুখ ও আত্ম আদি মূলক দৃষ্টি কখনো উৎপন্ন হয় না। কারণ তিনি শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞানের দ্বারা সৎকায় দৃষ্টিকে সমূলে প্রহাণ করেছেন।

খ) পৃথকজন পুদ্রালের ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) প্রতি, কুশলাকুশল কর্ম ও ফলের প্রতি এবং নবলোকুত্তর (চারি মার্গ, চারি ফল ও নির্বাণ) ধর্মের প্রতি বিচিকিৎসা বা সন্দেহ বিদ্যমান থাকে; কিন্তু শ্রোতাপন্ন পুদ্রালের সেগুলোর প্রতি কোন প্রকার বিচিকিৎসা বা সন্দেহ বিদ্যমান থাকেনা। যেহেতু শ্রোতাপন্ন পুদ্রাল শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞানের দ্বারা বিচিকিৎসাকে সমূলে প্রহাণ করেছেন।

গ) পৃথকজন পুদ্রালের গো-ব্রত, (গরুর ন্যায় চলাফেরা করা) কুকুর ব্রত (কুকুরের ন্যায় চলাফেরা করা) অথবা ইত্যাদি পূজা-অর্চনা ও কৃচ্ছ্র ব্রতাদির দ্বারা মোক্ষ-নির্বাণ লাভ হয় এরূপ শীলব্রত পরামর্শের দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকে কিন্তু শ্রোতাপন্নরা শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞানের দ্বারা শীলব্রত পরামর্শকে সমূলে প্রহাণ পূর্বক জ্ঞাত হন যে, শীলব্রত পরামর্শাদির দ্বারা কোন প্রকারে মার্গ তথা মোক্ষ-নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব। কেবলমাত্র মার্গ ভাবনা তথা বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের দ্বারাই মোক্ষ নির্বাণ লাভ করা সম্ভব।

ঘ) পৃথকজন পুদ্রালের নিজের পর্যাপ্ত ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও অতিলোভ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করার প্রবল

লোভ প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু শ্রোতাপন্থের নিকট কখনো অতিলোভ উৎপন্ন হয় না। কারণ শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞান উৎপত্তি ক্ষণে অতিলোভ প্রহাণ হয়ে থাকে। সেহেতু শ্রোতাপন্থরা নিজেদের যতটুকু ধন-সম্পত্তি আছে তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকেন।

ঙ) পৃথকজন পুঙ্গবের সহসা অতিদেহ(হিংসা) উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমনঃ অন্যের উন্নতিতে, সৌন্দর্য্যে, মহৎ কাজে ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে পরশ্রীকাতরতা ও অসন্তুষ্টিতা প্রদর্শন করা অথবা একটু বার তের হলে তীব্র ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া এবং অন্যকে মৈত্রী প্রদর্শন করতে অক্ষম হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু শ্রোতাপন্থেরা অপরের উন্নতিতে, দৈহিক সৌন্দর্য্যে, মহৎ কাজে ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি মুদিতা উৎপন্ন করে থাকেন অর্থাৎ অপরের আনন্দে নিজেকে আনন্দিত করেন-এমনকি তাদের প্রতি হিংসাত্মক আচার-ব্যবহার করলেও তারা মৈত্রী প্রদর্শন করে থাকেন।

চ) পৃথকজন পুঙ্গবের নিকট লৌকিক ও লোকুত্তর ধর্মাদির বিষয়ে অতিমোহ বা প্রবল অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শ্রোতাপন্থ পুঙ্গবের নিকট লৌকিক ও লোকুত্তর এই উভয় ধর্মাদির বিষয়ে কোন প্রকার অতিমোহ বিদ্যমান থাকে না।

ছ) পৃথকজন পুঙ্গবেরা পঞ্চশীলকে (প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা কথা বলা ও নেশাদ্রব্যাদি সেবন) যথায়তভাবে প্রতিপালন করতে পারেনা। তবে শিক্ষিত ব্যক্তি, সন্মানিত ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা - “যদি সে সব গর্হিত এবং নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হই তাহলে লোকেরা আমায় নিন্দা করবে ও খারাপ ভাববে” এরূপ চিন্তা করতঃ লোক সম্মুখে পঞ্চশীল রক্ষা করে বটে, কিন্তু সে লোক চক্ষুর অন্তরালে সুযোগ বুঝে পঞ্চশীল লঙ্ঘন তথা সে সব পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। যদিওবা কোন কোন শ্রদ্ধা সম্পন্ন পৃথকজন ইহ জীবনে পঞ্চশীল ভঙ্গ না করলেও ভবিষ্যত জন্মে ভঙ্গ করে থাকে। কিন্তু শ্রোতাপন্থ পুঙ্গবেরা জীবনের বিনিময়ে হলেও পঞ্চশীলকে রক্ষা করে থাকেন। তারা কোন প্রকারেও পঞ্চশীল ভঙ্গ করেন না।

জ) পৃথকজন পুদালেন চারি অপায়ের (তির্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয়) দরজা সদা উন্মুক্ত। কেননা পৃথকজন পুদাল কর্তৃক চারি অপায়ে জন্ম গ্রহণ কারী অতিলোভ, অতিদ্বेष ও অতিমোহকে প্রহাণ করা হয়নি। কিন্তু শ্রোতাপন্ন পুদালের চারি অপায়ের দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। তার কারণ হল তারা শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞানের দ্বারা অপায়ে জন্ম গ্রহণকারী অতিলোভ, অতিদ্বেষ ও অতিমোহ আদিকে সমূলে শ্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞানের দ্বারা প্রহান বা ছেদন করেছেন।

ঝ) পৃথকজন পুদালের গতি (জন্ম) অনিশ্চিত অর্থাৎ সে মনুষ্য লোকে, দেবলোকে অথবা অপায়ে - কোথায় জন্ম গ্রহণ করবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ পৃথকজনের কর্ম নিয়ন্ত্রণ নাই। তারা কুশল কর্ম ও অকুশল কর্ম উভয় প্রকার কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এই হেতু তাদের গতি অনিশ্চিত। কিন্তু শ্রোতাপন্ন পুদালের গতি সুনিশ্চিত অর্থাৎ তারা মনুষ্যালোক অথবা দেবলোক এই দু'লোকেই জন্ম গ্রহণ করে থাকেন।

ঞ) নিয়ত বর প্রাপ্ত পারমী সম্ভার পূরণকারী পুদাল ব্যতীত সকল পৃথকজন পুদালের নির্বাণ লাভ অনিশ্চিত অর্থাৎ সে কখন, কবে, কত বৎসর পরে, কত কল্পের পরে, কোন্ কল্পে অথবা কোন্ বুদ্ধের শাসন কালে নির্বাণ লাভ করবে তার কোন নির্দ্ধারিত বা নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু শ্রোতাপন্ন পুদালের নির্বাণ লাভ সুনিশ্চিত। কারণ শ্রোতাপন্ন পুদাল সাত জন্মের অধিক জন্ম গ্রহণ করে না, সাত জন্মের মধ্যেই তার নির্বাণ লাভ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রোতাপন্ন পুদালের প্রকার ভেদ

জাতি বা জন্মভেদে শ্রোতাপন্ন তিন প্রকার। যথাঃ ১. সন্তক্খত্তুপরম শ্রোতাপন্ন ২. কোলংকোল শ্রোতাপন্ন ৩. একবীজি শ্রোতাপন্ন। উক্ত তিন প্রকার শ্রোতাপন্ন বিষয়ে নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হল।

১) সন্তক্খত্তুপরম শ্রোতাপন্ন - যে পুদাল শ্রোতাপত্তি মার্গ-ফল লাভ করে মনুষ্য লোক তথা দেবলোকে সাত জন্মের অধিক বার জন্ম গ্রহণ করেনা - সাত জন্মের মধ্যেই তিনি অরহত্ত্ব মার্গ-ফল লাভ

করেই পরিনির্বাচিত হন, এরূপ পুদ্রালকেই “সন্তুখতুপরম স্রোতাপন্ন বা সাতবার জন্ম গ্রহণকারী স্রোতাপন্ন” বলে।

২) কোলংকোল স্রোতাপন্ন - যে পুদ্রাল স্রোতাপত্তি মার্গ-ফল লাভ করে মনুষ্য লোক তথা দেবলোকে দুই বা তিন কূল (জন্ম) পরিভ্রমণ করেই অরহত্ত্ব মার্গ ফল লাভ করে নির্বাণ লাভ করে থাকেন, এরূপ পুদ্রালকে “কোলংকোল স্রোতাপন্ন বা কূল হতে কুলান্তরে জন্ম গ্রহণকারী স্রোতাপন্ন” বলে।

৩) একবীজী স্রোতাপন্ন - যে পুদ্রাল স্রোতাপত্তি মার্গ ফল লাভ করে মনুষ্যলোক তথা দেবলোকে কেবলমাত্র একবার জন্ম গ্রহণ করে এরূপ পুদ্রালকে “একবীজী স্রোতাপন্ন বা একবার মাত্র জন্ম গ্রহণকারী স্রোতাপন্ন” বলে।

ধুর ভেদে স্রোতাপন্ন দুই প্রকার

১) সদ্ধাধুর স্রোতাপন্ন - শ্রদ্ধা ধুর স্রোতাপন্ন।

২) পঞ্ঞাধুর স্রোতাপন্ন - প্রজ্ঞা ধুর স্রোতাপন্ন।

এখানে “শ্রদ্ধা ধুর স্রোতাপন্ন” বুঝতে যে পুদ্রাল শ্রদ্ধাকে ভিত্তি করে বা প্রাধান্য দিয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে এবং বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা স্রোতাপত্তি মার্গ ফল লাভ করে তখন তাকে “সদ্ধাধুর স্রোতাপন্ন বা শ্রদ্ধাধুর স্রোতাপন্ন” বলে। যখন কেউ শ্রদ্ধাকে প্রাধান্য দিয়ে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনে রত থাকে, তখন তার প্রবল দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সে নিশ্চয় ইহ জীবনে স্রোতাপত্তি মার্গ ফল লাভ করতে হবে। এরূপ বিশ্বাস নিয়ে খুব কঠোরভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করেও শ্রদ্ধা প্রধান পুদ্রাল ধর্মকে যথাভূতভাবে জানতে সক্ষম হয় না। যখন সে নাম-রূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান লাভ করে তখনও সে নাম-রূপকে পৃথক পৃথক ভাবে নির্ণয় করতে পারে না; কেবলমাত্র সে ভাসাভাসা বা অস্পষ্টভাবে জানতে সক্ষম হয়। শুধুমাত্র যখন কল্যাণ মিত্র গুরু তাকে তা পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে বর্ণনা করে তখনই সে তা প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে, অন্যথায় অসম্ভব। এপ্রকারের পুদ্রালেরা বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন ব্যতীত কোন মতে মার্গ ধর্মাদি লাভ করতে

পারেনা। যখন তারা কল্যাণ মিত্র বিদর্শনাচার্যের কাছ থেকে নিজ চরিতানুযায়ী উপযুক্ত কর্মস্থান গ্রহণ পূর্বক বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে তখনই তারা বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রোতাপত্তি মার্গ ফলাদি লাভ করে থাকে।

এখানে “প্রজ্ঞাধুর শ্রোতাপন্ন” বুঝাতে যে পুঙ্খল প্রজ্ঞাকে প্রধান্য বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে এবং বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা শ্রোতাপত্তি মার্গ ফল লাভ করে তখন তাকে “পঞ্ঞা ধুর বা প্রজ্ঞাধুর শ্রোতাপন্ন” রূপে অভিহিত করা হয়।

প্রতিপদানুসারে শ্রোতাপন্ন শ্রদ্ধাধুর শ্রোতাপন্ন চার প্রকার

যথাঃ

১. কেউ কঠোরভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে, কিন্তু ধীর গতিতে ধর্মকে (মার্গ ও ফল ধর্ম) অধিগত করে থাকে।
২. কেউ কঠোরভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে, কিন্তু দ্রুতগতিতে ধর্মকে অধিগত করে থাকে।
৩. কেউ মৃদুভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে, কিন্তু ধীরগতিতে ধর্মকে অধিগত করে থাকে।
৪. কেউ মৃদুভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে, কিন্তু দ্রুতগতিতে ধর্মকে অধিগত করে থাকে।

প্রতিপদানুসারে প্রজ্ঞাধুর শ্রোতাপন্ন চার প্রকার

যথাঃ

১. কেউ কঠোরভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে, কিন্তু ধীর গতিতে ধর্মকে (মার্গ ও ফল ধর্ম) অধিগত করে থাকে।
২. কেউ কঠোরভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে, কিন্তু দ্রুতগতিতে ধর্মকে অধিগত করে থাকে।
৩. কেউ মৃদুভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে, কিন্তু ধীরগতিতে ধর্মকে অধিগত করে থাকে।
৪. কেউ মৃদুভাবে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করে, কিন্তু দ্রুতগতিতে ধর্মকে অধিগত করে থাকে।

ধর্মকে অধিগত করে থাকে।

উপরোক্ত চার প্রকার শ্রদ্ধাধুর শ্রোতাপন্ন এবং চার প্রকার প্রজ্ঞাধুর শ্রোতাপন্ন মিলে মোট আট প্রকার শ্রোতাপন্ন।

চব্বিশ প্রকার শ্রোতাপন্ন

উক্ত আট প্রকার শ্রোতাপন্নকে যখন পূর্বে উল্লেখিত জাতিভেদে তিন প্রকার শ্রোতাপন্নের সাথে যোগ করা হয়, তখন শ্রোতাপন্নের সংখ্যা হয় মোট চব্বিশ প্রকার। যেমনঃ

১. সত্ত্বক্খত্বপরম শ্রোতাপন্ন $৪ + ৪ = ৮$ প্রকার।

২. কোলংকোল শ্রোতাপন্ন $৪ + ৪ = ৮$ প্রকার।

৩. একবীজি শ্রোতাপন্ন $৪ + ৪ = ৮$ প্রকার।

মোট শ্রোতাপন্ন পুদ্গলের সংখ্যা ২৪ প্রকার।

তিন প্রকার বিপ্রলাস ধর্ম

“বিপ্রলাস” ইহা একটি পালি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে বাংলায় ভুল বিশ্বাস, মিথ্যা ধারণা, অযথার্থরূপে দর্শন করা অথবা যেটা যেক্রমে সেটাকে সেরূপে গ্রহণ না করে তা বিপরীতভাবে গ্রহণ করা ইত্যাদি। যেমনঃ সত্যকে মিথ্যারূপে আর মিথ্যাকে সত্য রূপে গ্রহণ করা ইত্যাদি।

বিপ্রলাস ধর্ম তিন প্রকার

১. সঞ্জ্ঞা বিপ্রলাস - সংজ্ঞা বিপ্রলাস বা সংজ্ঞা দ্বারা বিষয় বস্তুকে ভ্রান্তরূপে সংজ্ঞায়িত করা বা ধারণা করা।
২. চিত্ত বিপ্রলাস- চিত্ত বিপ্রলাস বা চিত্ত দ্বারা বিষয় বস্তুকে ভ্রান্তরূপে চিন্তা করা।
৩. দির্ঘিষ্ট বিপ্রলাস দৃষ্টি বিপ্রলাস বা দৃষ্টি দ্বারা বিষয় বস্তুকে ভ্রান্তরূপে বিশ্বাস করা।

আবার উপরোক্ত তিন প্রকার বিপ্রলাস ধর্ম সমূহকে আকার বিষয়াদি ভেদে বার প্রকার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তা নিম্ন রূপ :

সংজ্ঞা বিপ্রলাস চার প্রকার

১. অনিচ্ছে নিচ্ছন্তি সঞ্জ্ঞা বিপ্রলাসো - অনিত্যকে নিত্যরূপে ধারণা করা সংজ্ঞা বিপ্রলাস।
২. দুঃখে সুখন্তি সঞ্জ্ঞা বিপ্রলাসো- দুঃখকে সুখরূপে ধারণা করা সংজ্ঞা বিপ্রলাস।
৩. অনন্তনি অন্ততি সঞ্জ্ঞা বিপ্রলাসো- অনাত্মকে আত্মরূপে ধারণা করা সংজ্ঞা বিপ্রলাস।
৪. অসুভে সুভন্তি সঞ্জ্ঞা বিপ্রলাসো- অশুভকে শুভরূপে ধারণা করা সংজ্ঞা বিপ্রলাস।

চিত্ত বিপ্রলাস চার প্রকার

১. অনিচ্ছে নিচ্ছন্তি চিত্ত বিপ্রলাসো - অনিত্যকে নিত্যরূপে চিন্তা করা চিত্ত বিপ্রলাস।
২. দুঃখে সুখন্তি চিত্ত বিপ্রলাসো - দুঃখকে সুখরূপে চিন্তা করা চিত্ত

বিপ্রলাস।

৩. অনন্তনি অন্ততি চিত্ত বিপ্রলাসো - অনাত্মকে আত্মরূপে চিন্তা করা চিত্ত বিপ্রলাস।
৪. অসুভে সুভক্তি চিত্ত বিপ্রলাসো - অশুভকে শুভরূপে চিন্তা করা চিত্ত বিপ্রলাস।

দিটিষ্ঠ বিপ্রলাস চার প্রকার

১. অনিচ্ছে নিচ্ছন্তি দিটিষ্ঠ বিপ্রলাসো - অনিত্যকে নিত্যরূপে বিশ্বাস করা দৃষ্টি বিপ্রলাস।
২. দুঃখে সুখন্তি দিটিষ্ঠ বিপ্রলাসো- দুঃখকে সুখরূপে বিশ্বাস করা দৃষ্টি বিপ্রলাস।
৩. অনন্তনি অন্ততি দিটিষ্ঠ বিপ্রলাসো - অনাত্মকে আত্মরূপে বিশ্বাস করা দৃষ্টি বিপ্রলাস।
৪. অসুভে সুভক্তি দিটিষ্ঠ বিপ্রলাসো - অশুভকে শুভরূপে বিশ্বাস করা দৃষ্টি বিপ্রলাস।

উল্লেখিত সঞ্ঞা, চিত্ত ও দিটিষ্ঠ এই বিপ্রলাস ত্রয়কে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও অশুভ আকারাদি ভেদে ১২ প্রকার বিপ্রলাস ধর্মে অন্তর্ভুক্ত পূর্বক শ্রেণী বিন্যাস করে প্রদর্শিত হল।

সংজ্ঞা বিপ্রলাস কিরূপ?

এখানে “সংজ্ঞান” অর্থে সঞ্ঞা বা সংজ্ঞা অথবা ষড়ালম্বণে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন) পতিত লাল, নীল, সাদা-কালো, হ্রস্ব-দীর্ঘ, সুশ্রী-কুশ্রী ইত্যাদি আলম্বনের চিহ্ন আকৃতি আদি যথাযতভাবে জানে - এই অর্থে ‘সংজ্ঞা’ আর প্রকৃত সত্যকে না জেনে ঠিক তার উল্টো মিথ্যাকে সত্যরূপে গ্রহণ করে এই অর্থে ‘বিপ্রলাস’। যেমন অনিত্যকে নিত্য রূপে, দুঃখকে সুখ রূপে, অনাত্মকে আত্মরূপে, এবং অশুভকে শুভ রূপে গ্রহণ করে ইত্যাদি। সুতরাং এক কথায় বলতে গেলে ‘সংজ্ঞা বিপ্রলাস’ এর অর্থ হচ্ছে - অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও অশুভ ধর্মের অধীন এই নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধকে আমি, আমার, স্ত্রী, পুরুষ, নিত্য, সুখ, আত্ম ও শুভরূপে সংজ্ঞান

পূর্বক গ্রহণ করাকেই “সংজ্ঞা বিপ্রলাস” রূপে জানতে হবে।

চিন্তা বিপ্রলাস কিরূপ?

“চিন্তা করে” এই অর্থে চিন্তা। মূলতঃ চিন্তা বিপ্রলাস বলতে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও অশুভ ধর্মের অধীন এই নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধকে আমি, আমার, স্ত্রী, পুরুষ, নিত্য, সুখ, আত্ম ও শুভ রূপে চিন্তা করাকেই “চিন্তা বিপ্রলাস” রূপে জ্ঞাতব্য।

দৃষ্টি বিপ্রলাস কিরূপ?

এখানে “দৃষ্টি” বলতে মিথ্যা বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা অথবা সত্যকে মিথ্যারূপে আর মিথ্যাকে সত্যরূপে জানা বা বিশ্বাস করা। মূলতঃ দৃষ্টি বিপ্রলাস এর অর্থ হচ্ছে, নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যকে নিত্যরূপে, দুঃখকে সুখরূপে, অনাত্মকে আত্মরূপে ও অশুভকে শুভরূপে জানা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকেই “দৃষ্টি বিপ্রলাস” বলে। উক্ত তিন প্রকার বিপ্রলাস ধর্ম সমূহকে আরো সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য নিম্নে তিনটি উপমা প্রদান করা হলঃ

১. সংজ্ঞা বিপ্রলাস বন্য মৃগ সদৃশ। যেমন, অরণ্যে শস্য মালিক মৃগাদির কবল থেকে শস্য ক্ষেত্র রক্ষা করার জন্য শস্য ক্ষেত্রের মাঝখানে তৃণ-মানব তৈরী করে মানুষের ন্যায় জামা-কাপড় পড়িয়ে দেয় এবং মাটির কলসীতে সাদা কালোর রং প্রলেপ দ্বারা মুখমণ্ডল রঞ্জিত পূর্বক হাতে তীর ও ধনুক দিয়ে স্থাপন করে থাকে। যখন বন্য মৃগরা দল বেধে শস্য ক্ষেত্রে আসে, তখন মৃগদল সে তৃণ-মানবটিকে শস্য ক্ষেত্রের মাঝখানে দেখে তা প্রকৃত মানব মনে করে শস্যাদি না খেয়ে মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করে। এখানে যেক্ষেত্রে তৃণ মানবটি বন্য মৃগগুলোকে প্রকৃত মানব রূপে বিভ্রান্তি করে, ঠিক সেরূপে সংজ্ঞা বিপ্রলাস ও নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যকে নিত্যরূপে, দুঃখকে সুখরূপে, অনাত্মকে আত্মরূপে এবং অশুভকে শুভরূপে সংজ্ঞানন পূর্বক বা সংজ্ঞায়িত করে সত্ত্ব-জীবগণকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করে থাকে।

২. চিন্তা বিপ্রলাস যাদুকর সদৃশ। যাদুকর যখন চতুর্দিকে বেষ্টিত লোকারণ্যের মাঝখানে দাড়িয়ে একখণ্ড মাটির পিণ্ডকে হাতে নিয়ে আপন যাদু-বিদ্যার বলে তা স্বর্ণ বা রৌপ্যের পিণ্ডের আকার ধারণ

করিয়ে উপস্থিত জনতাকে দর্শন করায়; তখন তা দেখে উপস্থিত জনতা এরূপ চিন্তা করে যে, অহো কি অদ্ভুত! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যাদুকর মহাশয় মাটির পিণ্ডটিকে স্বর্ণ বা রৌপ্য পিণ্ডাকারে বানিয়ে দিল! এভাবে তখন দর্শনরত জনতা সকলেই তা বিশ্বাস করে থাকে। এখানে যাদুকর দর্শনরত জনতাকে যেভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, ঠিক সেরূপে চিত্ত বিপ্রলাসও নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যকে নিত্যরূপে, দুঃখকে সুখরূপে, অনাত্মকে আত্মরূপে এবং অশুভকে শুভরূপে চিন্তা করিয়ে সত্ত্ব-জীবগকে প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও বিভ্রান্ত করে থাকে।

৩. দৃষ্টি বিপ্রলাস পথ ভ্রান্ত পথিকের ন্যায়। গভীর অরণ্যে প্রবেশকারী জনৈক পথচারী যখন পথ চলতে চলতে গন্তব্য মার্গ ভুলে যায়, তখন সে একেবারেই দিশেহারা হয়ে যায় এমতাবস্থায় অরণ্যে অবস্থান রত অসং যক্ষরা তাকে ভুল পথে পরিচালনা করে ভক্ষন করার অভিপ্রায়ে নিজেদের মায়াবলে গ্রাম বা নগরীর পথ তৈরী করে থাকে। আর যখন পথ ভ্রান্ত জনৈক পথচারী অসং যক্ষদের কর্তৃক নির্মিত গ্রাম বা নগরীর পথ দর্শন করে, তখন সে চিন্তা করে যে বোধ হয় এটাই আমার গন্তব্যের পথ। এই ভেবে সে জনৈক পথচারী তা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে নিজেকে ভুল পথে পরিচালনা করার ন্যায় চিত্ত বিপ্রলাসও নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যকে নিত্য রূপে, দুঃখকে সুখ রূপে, অনাত্মকে আত্মরূপে এবং অশুভকে শুভরূপে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সত্ত্ব-জীবগণকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্তি করে থাকে।

পঞ্চ নিয়ম

এখানে “পঞ্চ নিয়মোতি” বলতে সুনির্দিষ্ট পাঁচ প্রকার মহাজাগতিক নিয়ম বা নীতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। সে পাঁচ প্রকার নিয়মের মধ্য দিয়েই জীব জগত ও জড় জগত উৎপত্তি ও ধ্বংসের এক অভিন্ন সু-সংগত নিয়মে প্রবর্তিত হয়ে থাকে।

সে পাঁচ প্রকার নিয়ম কি কি?

সে পাঁচ প্রকার নিয়ম হল যথা : (১) ঋতু নিয়ম, (২) বীজ নিয়ম, (৩) কর্ম নিয়ম, (৪) ধর্ম নিয়ম ও (৫) চিত্ত নিয়ম।

উপরোক্ত পাঁচ প্রকার নিয়মকে শ্রেণীবিন্যাস করে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

(১) “উত্থাননিয়মোতি” বলতে বাংলায় ঋতু নিয়মকে বুঝায়। যেমন - গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ইত্যাদি। কিন্তু, এখানে ঋতু নিয়ম বলতে তা বুঝানো হচ্ছে না। বৌদ্ধ দর্শনে ঋতু বলতে শীত ও গরমের চক্র প্রবাহকে বুঝানো হয়।

আবার এই শীত ও গরমের চক্র প্রবাহকে তেজো বা তেজ ধাতুর স্বভাব ধর্মতা বলা হয়। সুতরাং ঋতু নিয়ম বলতে আমাদেরকে বুঝতে হবে ‘তেজ’ ধাতুর শীত ও গরমের চক্র প্রবাহের নিয়মকে। বৌদ্ধ দর্শনে তেজ ধাতুকে ‘রূপ’ বা জড় পদার্থ রূপে বিবেচনা করা হয় - যা ইহাকে ‘মহাভূতরূপ’ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভূত রূপ আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা - পাঠবী ধাতু, আপো ধাতু, তেজো ধাতু ও বায়ো ধাতু। এখানে ‘পাঠবী ধাতু’ বলতে পৃথিবী ধাতু রূপের বিস্তৃতি, কঠিনতা ও কোমলতার স্বভাব ধর্মতাকে বুঝায়।

‘আপো ধাতু’ বলতে জল ধাতু রূপের বন্ধন বা একিভূত করণের স্বভাব ধর্মতাকে বুঝায়। এই আপো ধাতুই অন্যান্য ধাতুত্রয়কে বিচ্ছিন্ন হতে না দিয়ে একে অন্যকে একত্রে বন্ধন বা জড়ো করে রাখে। “তেজো ধাতু” বলতে তেজ ধাতুর গরম ও শীতলতার স্বভাব ধর্মতাকে বুঝায়। গরম বা উষ্ণতা হচ্ছে তেজধাতুর স্বাভাবিক স্বভাব ধর্ম আর শীতলতা হচ্ছে তেজ ধাতুর মন্দা স্বভাব ধর্ম। “বায়ো ধাতু” বলতে বায়ু ধাতুর সক্রিয় সঞ্চালন গতি শক্তিকে বুঝায়। এই বায়ু ধাতুর সক্রিয়

গতিশীলতার দ্বারাই সমস্ত জড় জগতে বস্তুর গতিশীলতা, বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি, সঞ্চালন এবং প্রসারণের ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। উক্ত চার প্রকার মহাভূত রূপ সমূহ পরস্পর অন্যোন্ময় প্রত্যয় (অঃমঃমঃমঃ পচ্যো) হয়। অর্থাৎ চারি মহাভূত রূপ সমূহ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে প্রবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন একটি উৎপত্তির ক্ষণে অপর তিনটির উৎপত্তি হয়ে থাকে আর একটি বিলয় বা ধ্বংসের ক্ষণে অপর তিনটিরও বিলয় হওয়া অনিবার্য। এভাবে চারি মহা ভূতরূপ সমূহ একে অন্যের প্রতি অন্যোন্ময় প্রত্যয়, সহজাত প্রত্যয় ও নিশ্রয় প্রত্যয় হয়ে অবিচ্ছিন্ন নদীশ্রোতের ন্যায় অথবা অবিচ্ছিন্ন দীপশিখার ন্যায় স্ব স্ব স্বভাব ধর্ম সমূহকে নিয়ে প্রবর্তিত হয়ে থাকে। বৌদ্ধ দর্শনে এই জড় পদার্থ রূপকে অতীব সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ বা বিভাজন পূর্বক বিবেচনা করা হয়। যেমনঃ ৩৬টি অণু একত্রিত করলে একটি পরমাণু হয়, ৩৬টি পরমাণু যোগ করলে একটি তজ্জরির সমান হয়, ৩৬টি তজ্জরি একত্র করলে একটি রথরেণু গঠিত হয় এবং ৩৬টি রথরেণু মিলে একটি লিক্খা নামক অতীব সুক্ষ্ম রূপ গঠিত হয়ে থাকে। এই লিক্খা রূপই জড় পদার্থের সবচাইতে সুক্ষ্ম রূপ। উক্ত লিক্খা রূপ নাকি অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রতি চোখের পলকে ৫ (পাঁচ) হাজার কোটি রূপ উৎপন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে থাকে। সুতরাং উপরোক্ত পর্যালোচনায় জানা যায় যে, চারি মহাভূত রূপ সমূহ অবিভাজ্য অর্থাৎ একে অন্যকে ছাড়া অবস্থান করতে পারে না, একই স্থানে, একই পিণ্ডে এবং একই অণু-পরমাণুতে একত্র বা একিভূত হয়ে করে থাকে। এই জড় পৃথিবী উক্ত চার প্রকার মহাভূত ধাতু রূপ সমূহ দ্বারাই গঠিত বা সৃষ্টি হয় এবং চার প্রকার মহাভূত ধাতু রূপ সমূহ হতে পৃথিবী ধাতু ব্যতীত অগ্নি, জল ও বায়ু এই ধাতুত্রয়ের দ্বারাই এই জড় পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে থাকে। একদা রাজা মিলিন্দ নাগসেন ভাস্করের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - ভাস্ক্রে, ঋতু নিয়মের কারণে কি কি উৎপন্ন বা সৃষ্টি হয়? তখন ভাস্ক্রে নাগসেন এভাবে উত্তর দিলেন - মহারাজ, ঋতু নিয়মের কারণে এই মহাপৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গরম, নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ঋতু নিয়মের কারণে যে শুধুমাত্র সৃষ্টি হয় তা নয়, অধিকন্তু কালের বিবর্তনে

সমস্ত সৃষ্ট জড়পদার্থকেও ধ্বংস করে থাকে। শাস্ত্রে উক্ত মতে যখন তেজ ধাতুর দ্বারা এই মহা পৃথিবী ধ্বংস হয়, তখন নিম্নে অবীচি নরক হতে উর্দ্ধে “অভস্‌সর” ব্রহ্মলোক সহ মোট ১৯টি ভূমি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আপোধাতু বা জল ধাতুর দ্বারা যখন মহাপৃথিবী ধ্বংস হয়, তখন নিম্নে অবীচি নরক হতে উর্দ্ধে “সুভকিণ্ণ” ব্রহ্মলোক সহ মোট ২২টি ভূমি ধ্বংস হয়ে থাকে এবং যখন বায়ু ধাতুর দ্বারা এই মহা পৃথিবী ধ্বংস হয়, তখন নিম্নে অবীচি নরক হতে উর্দ্ধে “বেহপ্‌ফল” ব্রহ্মলোক সহ মোট ২৩টি ভূমি ধ্বংস বা বিনাশ হয়ে থাকে। কাজেই উপরোক্ত পর্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি সৃষ্টি ও ধ্বংস হওয়ার মূল আদি কারণ হচ্ছে - ‘ঋতু নিয়মের সক্রিয় প্রবাহ’। ইহা কোন দেব-ব্রহ্মা বা ঈশ্বরাদির দ্বার সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস হয় না।

২) বীজ নিয়মোঁতি - বলতে এখানে যে যে বীজের সে সে বৃক্ষের ফল-ফুল, লতা-পাতা, টক-মিষ্টি, কষাদি সহ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ধর্মতাকেই “বীজ নিয়ম” বলা হয়। যেমন নারিকেলের মাথায় ছিদ্র এবং অভ্যন্তরে পানি বিদ্যমান থাকা, সূর্যমুখী ফুল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকা, মারুত লতা কিংবা অন্যান্য লতাদি বৃক্ষের অভিমুখে উখিত হওয়া, দক্ষিণ বল্ললতা দক্ষণাবর্ত হয়ে বৃক্ষে উঠা, ফল-মূলের মিষ্টি, টক, কষা ইত্যাদির স্বাদ ধারণ করা এবং বীজের ধর্মতানুসারে ফল-ফুল প্রদান করা সহ ইত্যাদি এই সবই বীজ নিয়মের কারণেই হয়ে থাকে।

বীজ পাঁচ প্রকার

১. মূলজ বীজ - যে সকল বৃক্ষলতাদি মূল বা শিকড় হতে অঙ্কুরোদগম হয়, সে সকল বৃক্ষ-লতাদিকে মূলজ বা মূল হতে উৎপন্ন বীজ বলে।
২. পত্রজ বীজ - যে সকল বৃক্ষ লতাদি পত্র বা পাতা হতে অঙ্কুরোদগম হয়, সে সকল বৃক্ষ লতাদিকে পত্রজ বা পাতা হতে উৎপন্ন বীজ বলে।
৩. সন্ধিজ বীজ - যে সকল বৃক্ষ লতাদি সন্ধি বা গ্রন্থি হতে অঙ্কুরোদগম হয়, সে সকল বৃক্ষ লতাদিকে সন্ধিজ বা গ্রন্থি হতে উৎপন্ন বীজ বলে।
৪. অঙ্কুরজ বীজ - যে সকল বৃক্ষ লতাদি অঙ্কুর হতে উৎপন্ন হয়, সে

সকল বৃক্ষ লতাদিকে অঙ্কুরজ বা অঙ্কুর হতে উৎপন্ন বীজ বলে।

৫. বীজ বীজ - যে সকল বৃক্ষ লতাদি বীজ হতে অঙ্কুরোদগম হয়, সে সকল বৃক্ষ লতাদিকে বীজ বীজ বা বীজ হতে উৎপন্ন বীজ বলে।

৩. কন্ম নিয়োমো'তি বলতে এখানে সমস্ত কুশলাকুশল কর্মের সক্রিয় “চেতনা নিয়ম” কে বুঝানো হয়েছে। কারণ চেতনাই কুশলাকুশল কর্মকে নির্ণয় করে থাকে। কাজেই বৌদ্ধ ধর্মে কর্ম বুঝাতে সক্রিয় কুশলাকুশল চেতনাকেই বুঝতে হবে। চেতনা ব্যতীরেকে কর্ম সম্পাদিত হতে পারে না। বিদ্যমান সক্রিয় চেতনার দ্বারাই পুরিপূর্ণ কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর যেখানে কর্ম সম্পাদিত হবে, সেখানে সে কর্মের অনিবার্য বিপাক নিহিত। যেমন কুশল কর্ম সু-বিপাক প্রদান করা আর অকুশল কর্ম কু-বিপাক প্রদান করা- এর কোন ব্যতিক্রম না ঘটে তার আপন স্বভাব ধর্মতানুসারে বিপাক বা ফল প্রদান করা ইহাই কর্ম নিয়মের মূল স্বভাব ধর্মতা। কর্মের আর্বতন বা অবস্থানুসারে একেকটি কর্মের চারটি অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য ধর্মতা লক্ষ্যণীয়। যথা : চেতনাবর্তন, কর্মাবর্তন, নিমিত্তবর্তন ও বিপাকাবর্তন।

(ক) চেতনাবর্তন - বলতে কামবচর, রূপবচর ও অরূপবচরের মোট ২৯ প্রকার লৌকিক চিত্ত সমূহকে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদনের অভিপ্রায়ে চেতিয়ে দেওয়া, জাগিয়ে দেওয়া, কর্ম নির্দ্ধারণ করে দেওয়া অথবা কর্ম সিদ্ধির জন্য প্ররোচিত করিয়ে দেওয়াকেই - “চেতনাবর্তন” বলে। এস্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে, লৌকিক চিত্ত সমূহতে চেতনাই মূখ্য বা প্রধান আর অপর পক্ষে লোকুত্তর চিত্ত সমূহতে প্রজ্ঞাই মূখ্য বা প্রধান। চেতনা সহগত লৌকিক চিত্ত সমূহ কর্ম সংগ্রহ পূর্বক সংসার পরিভ্রমণকে সু-দীর্ঘায়িত করে থাকে, আর কিন্তু লোকুত্তর চিত্ত সমূহ ক্লেশ সমূহকে প্রহাণ বা বিনাশ করে নিরোধ সত্য নির্বাণ লাভ করে থাকে।

(খ) কর্মাবর্তন - বলতে চেতনার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ত্রি-দ্বারে (কায়, বাক্য ও মনে) কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করাকেই “কর্মাবর্তন” বলে। কর্মাবর্তনের কারণেই সত্ত্ব জীবগণ নানা শ্রেণীতে, নানা নিকায়ে বিভক্ত হয়ে থাকে। আবার এই কর্মাবর্তনকে “কর্ম ভব” নামেও

উল্লেখ করা হয়। কর্মাবর্তনের দ্বারাই সত্ত্ব জীবগণ ক্ষণ মহুত বর্তমান কালে প্রতিনিয়ত ত্রি-দ্বারে কোন না কোন একদ্বারে কর্ম সম্পাদন পূর্বক অনাগত উৎপত্তি ভবের জন্য কর্ম-বিপাক সঞ্চয় করে থাকে।

(গ) নিমিত্তাবর্তন বলতে জীবিত কালে যে যে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে, সে সে সম্পাদিত কুশলাকুশল কর্মাদি আসন্ন কর্মে (মৃত্যুক্ষণ) ব্যক্তির স্মৃতিপটে নিমিত্তাকারে উদিত হওয়াকেই - “নিমিত্তাবর্তন” বলে। এখানে নিমিত্ত দুই প্রকার। যথা : কর্ম নিমিত্ত ও গতি নিমিত্ত। যেমন - জীবিত কালে দান দেওয়া, ধর্ম শ্রবণ করা, শীলাদি প্রতি পালন করা, অথবা ভাবনাদি অনুশীলন সহ ইত্যাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করা এবং অন্যপক্ষে প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচারাদি সহ ইত্যাদি কৃত অকুশল কর্ম সমূহ নিমিত্তাকারে আসন্ন কর্মে স্মৃতিপটে উদিত হওয়াকেই “কর্ম নিমিত্ত” বলে আর কর্ম নিমিত্ত যে যে ভাবে স্মৃতিপটে উদিত হবে, ঠিক সে সে ভাবে গতি নিমিত্তও স্মৃতিপটে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমন, কর্ম নিমিত্ত যদি কুশল সহগত হয়, তাহলে তখন গতি নিমিত্ত ও কুশল হয়ে থাকে এবং ব্যক্তির সু-গতির জন্য দিব্য বিমান, দিব্য প্রাসাদ ইত্যাদি গতি নিমিত্তাকারে ব্যক্তির স্মৃতিপটে উদিত হয় আর যদি কর্ম নিমিত্ত অকুশল সহগত হয়, তখন গতি নিমিত্তও অকুশল হয়ে ব্যক্তির দুর্গতির নিমিত্তে যমদূত, নিরয়ান্নি সহ ইত্যাদি ভীতিপ্রদ আলম্বণ নিমিত্তাকারে ব্যক্তির স্মৃতিপটে উৎপন্ন হওয়াকেই - “গতি নিমিত্ত” বলে। সুতরাং আমরা উপরোক্ত নিমিত্তাবর্তনের পর্যালোচনায় দেখতে পায় যে, জীবিত কালে সমস্ত কুশলাকুশল কর্ম সমূহের মধ্য হতে যে কোন একটি কর্ম আসন্ন কর্মে কর্ম নিমিত্তাকারে উৎপন্ন হয় এবং তাকে আলম্বণ করে গতি নিমিত্ত উৎপন্ন হয়ে ব্যক্তির গতি বা জন্মকে সুনির্দিষ্ট করে থাকে - ইহাই নিমিত্তাবর্তনের তাৎপর্য।

(ঘ) বিপাকাবর্তন - বলতে যে যে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, সে সে কুশলাকুশল কর্মের পরিপক্বতাকেই “বিপাকাবর্তন” বলে। এখানে কর্মের পরিপক্বতা বুঝাতে তরুণ অবস্থা হতে পরিপক্ব হওয়া অথবা সম্পাদিত কুশলাকুশল কর্মের তদানুরূপ ফল বা বিপাক প্রদান করাকে বুঝায়। যে কোন একটি কুশলাকুশল কর্মের চেতনা যদি জবন

বীথির সাতটি জবন ক্ষণের প্রথম জবন লাভ করে, তখন সেটা “দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম” রূপ ধারণ করে এবং এই কর্মের ফল ইহজীবনেই প্রদান করে থাকে। যদি তা ইহ জীবনে ফল প্রদান করতে না পারে, তাহলে তখন তা “অহোসি কর্ম” হয়ে যায়। অর্থাৎ বন্ধ্য বা ফল প্রদানে অক্ষম হয়ে যায়। আর যদি কোন কুশলাকুশল কর্ম সপ্ত জবন ক্ষণের সপ্তমতম জবন লাভ করে, তখন তা “উপপজ্জবেদনীয় কর্ম” রূপ ধারণ করে এবং তা মৃত্যুর পরপরই পরজন্মে বিপাক প্রদান করে থাকে। এই উপপজ্জবেদনীয় কর্ম কুশল পক্ষে অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভ এবং অকুশল পক্ষে পঞ্চ আনন্তরিক কর্ম বা গুরু কর্ম। আর কোন কুশলাকুশল কর্ম যদি সপ্ত জবন ক্ষণের পঞ্চম জবন লাভ করে, তখন তা “অপরাপরিয় বেদনীয় কর্ম” রূপ ধারণ করে এবং এই কর্ম যতদিন না অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ না হয়, ততদিন পর্যন্ত অনুকূল বিপাক প্রদান করার হেতু বা কারণ পাওয়া মাত্রাই কর্তাকে বিপাক প্রদান করে থাকে। এই কর্ম কখনো অহোসি কর্মে পরিণত হয় না।

(৬) ধম্ম নিযোমো’তি বলতে জন্ম জন্মান্তরে সম্যক সম্বোধি জ্ঞান লাভের অভিপ্রায়ে পারমী সম্ভার পরিপূরণকারী প্রজ্ঞা প্রধান, শ্রদ্ধা প্রধান ও বীর্য প্রধান বোধিসত্ত্বগণ কোন এক সম্যক সম্বুদ্ধগণ হতে নিয়তবর প্রাপ্ত হয়ে, প্রজ্ঞা প্রধান বোধিসত্ত্বের চারি অসংখ্য এক লক্ষাধিক কল্প, শ্রদ্ধা প্রধান বোধিসত্ত্বের আট অসংখ্য এক লক্ষাধিক কল্প এবং বীর্য প্রধান বোধিসত্ত্বের ষোল অসংখ্য এক লক্ষাধিক কল্পাবধি দশ-সমতিংশ পারমী সম্ভার পূর্ণ করে অন্তিম জন্মে বোধিসত্ত্বগণের যে ত্রিশ প্রকার ধর্মতা সংঘটিত হয়ে থাকে সেগুলোকেই ‘ধম্ম নিযোমো বা ধর্ম নিয়ম’ বলে। নিম্নে সেই ত্রিশ প্রকার ধর্মতা শ্রেণী বিভাগ করে উল্লেখ করা হল।

সম্যক সম্বুদ্ধগণের ত্রিশ প্রকার নিয়ম বা ধর্মতা তা নিম্নরূপ

যেমনঃ

১. অন্তিম জন্মে বোধিসত্ত্বগণ স্মৃতিমান হয়ে মাতৃজঠরে জন্ম গ্রহণ করেন।
২. মাতৃজঠরে বুদ্ধাসনে উপবেশন করে বাহির মূখী হয়ে অবলোকন করা।

৩. বোধিসত্ত্বের মাতা দাড়ান অবস্থায় সন্তান প্রসব করা ।
৪. অরণ্য প্রদেশে মাতৃকৃষ্ণি হতে বহিনিষ্ক্রমণ করা ।
৫. কাঞ্চন পট ও সোনার জরি বস্ত্রে দভায়মান হয়ে তা হতে উত্তর দিকে সপ্তপদ গমন করা ।
৬. সপ্তপদ গমন পূর্বক চতুর্দিকে অবলোকন করে -“আমি জ্যেষ্ঠ,আমি শ্রেষ্ঠ” বলিয়া অভীত সিংহনাদ করা ।
৭. বৃদ্ধ, রোগী, মৃতদেহ ও সন্ন্যাসি এই চারি নিমিত্ত দর্শন পূর্বক উৎকর্ষিত হয়ে, পুত্র লাভের পর মহাভিনিষ্ক্রমণ করা ।
৮. অরহত ধ্বজা বা চীবর পরিহিত প্রব্রজিত দর্শন করে সপ্তাহ কাল পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভের প্রচেষ্টা করা ।
৯. বুদ্ধত্ব লাভের দিন পায়সান্ন ভোজন করা ।
১০. কুশাসনে উপবেশন করে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করা ।
- ১০ আনাপানা কর্মস্থান ভাবনা করা ।
- ১১ মার সৈন্য পরাজয় করা ।
১৩. বৌধি মন্ডপে ত্রিবিদ্যা দি অসাধারণ জ্ঞান লাভ করা ।
১৪. সাত সপ্তাহ কাল ব্যাপী বৌধি মন্ডপে অবস্থান করা ।
১৫. ধর্ম দেশনার জন্য মহাব্রহ্মার প্রার্থনা ।
১৬. মৃগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করা ।
১৭. মাঘী পূর্ণিমায় পাতিমোক্ষ নির্দেশ করা ।
১৮. শ্রাবস্তীর নগর দ্বারে যমক প্রাতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন ।
১৯. তাবতিংস ভবনে মাতাকে উদ্দেশ্য করে অভিধর্ম দেশনা করা ।
২০. দেবলোক হতে সাংকাস্য নগরে অবতরণ করা ।
২১. সতত ফল সমাপত্তি লাভ করা ।
২২. ফল সমাপত্তি ও নিরোধ সমাপত্তি এই দুই সমাপত্তিত বসে বিনীত করিবার উপযোগী সত্ত্বগণকে অবলোকন করা ।
২৩. কারণ উৎপন্ন হলে শিক্ষাপদ সংস্থাপন করা ।
২৪. প্রয়োজন দেখে জাতক দেশনা বা বর্ণনা করা ।
২৫. জ্ঞাতিগণের সমাগমে বুদ্ধ বংশ বর্ণনা করা ।
২৬. আগন্তুক ভিক্ষুগণের সঙ্গে কুশলাকুশল ধর্মালোচনা করা ।
২৭. যাদের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে বর্ষা যাপন করেন, তাদেরকে না বলে

কোন দিকে গমন না করা ।

২৮. প্রত্যহ দিবসে পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন, রাত্রির প্রথম যাম, মধ্যম যাম ও শেষ যামে বুদ্ধ কৃত্য সম্পাদন করা ।^১

২৯. মহাপরিনির্বাণ লাভের দিনে মাংস রস ভোজন করা ।

৩০. চতুর্বিংশতি কোটি লক্ষ সমাপত্তি সমাপনান্তে অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করা । এখানে জেনে রাখা ভালো যে, ত্রিশ প্রকার নিয়ম বা ধর্মতা কেবলমাত্র সম্যক সম্মুদগণের অন্তিম জন্মই সংঘটিত হয়ে থাকে, অন্যকোন সত্ত্বের বেলায় সংঘটিত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে

(চ) চিন্তা নিয়োমো'তি বলতে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দ্বাদশ আয়তনাদির সংস্পর্শে চিন্তা উৎপন্ন হয় এবং চিন্তা বীথিতে উৎপন্ন চিন্তা বিলয়ের ক্ষণে অন্য এক অভিন্ন চিন্তা উৎপন্ন করে থাকে । এভাবে চিন্তা সমূহ এক নয় ভিন্নও নয় স্ব স্ব স্বভাবানুসারে অবিচ্ছিন্ন নদী স্রোতের ন্যায় আপন নিয়মে চিন্তা বীথিতে উৎপন্ন ও বিলয় হওয়ার ধর্মতাকেই - “চিন্তা নিয়োমো'তি বা চিন্তা নিয়ম” বলে । যখন চক্ষু আয়তনে রূপায়তন পতিত হয়ে সংস্পর্শিত হয়, তখন চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; চক্ষু০. বিজ্ঞান বিলয়ের ক্ষণে প্রত্যয় শক্তি দ্বারা সম্প্রটিচ্ছন্ন নামক অন্য এক চিন্তা উৎপন্ন করে থাকে । এভাবে সত্তিরণ চিন্তা, বোধাপন চিন্তা, সপ্ত জবন চিন্তা, তদালম্বন চিন্তা উৎপন্ন হয়ে বিলয় হয়ে পুনঃরায় ভবাঙ্গ প্রবাহে চিন্তা প্রবাহিত হয়ে থাকে । একই নিয়মে পঞ্চদ্বারাবর্তন চিন্তা এবং মনোদ্বারাবর্তন চিন্তা সহ সকল প্রকার চিন্তা সমূহ এক নয় ভিন্ন নয়, এক চিন্তা উদয়ের ক্ষণে অন্য চিন্তার বিলয় হওয়া অথবা এক চিন্তা বিলয়ের ক্ষণে অন্য এক চিন্তার উদয় হওয়া ইত্যাদি । অধিকন্তু একই ক্ষণে দু'টি চিন্তা উৎপন্নও হয় না এবং একই ক্ষণে দু'টি চিন্তা বিলয়ও হয় না, এক ক্ষণে একটি মাত্র চিন্তাই উৎপন্ন হয় এবং একটি মাত্র চিন্তাই বিলয় হয়ে থাকে । এভাবে চিন্তা সমূহের স্ব স্ব স্বভাব ধর্মে স্থিত থাকে এবং তার কোন বিপরীত বা ভিন্নতা হয় না বলেই এটাকে - “চিন্তা নিয়ম” বলা হয় ।

মহা অসংস্কৃত ধাতু নির্বাণ

সর্বজ্ঞ বুদ্ধের বর্ণিত চারি পরমার্থ ধর্ম (চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ) সমূহের মধ্যে “নির্বাণ” একটি পরমার্থ ধর্ম। ‘পরমার্থ ধর্ম’ বলতে যে যে ধর্ম সমূহ স্ব স্ব স্বভাব ধর্মে স্থিত থাকে, নিজের স্বভাব ধর্ম হতে কখনো বিপরীত হয় না অথবা ঈশ্বর-সৃষ্টিকর্তা, দেব-ব্রহ্মাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় না - তা কেবল আপন আপন স্বভাব ধর্মের প্রবাহে সর্বদা অচল, স্থির, অভিন্নতা ও বিপরীত হয় না বলেই ‘পরমার্থ ধর্ম’ বলা হয়। চারি পরমার্থ ধর্ম সমূহের মধ্যে চিত্ত, চৈতসিক এবং রূপ এই পরমার্থ ধর্মত্রয় স্কন্ধ যুক্ত ও হেতু প্রত্যয়াধীন। যার কারণে এই পরমার্থ ধর্মত্রয় হেতু প্রত্যয়ের কারণে উৎপন্ন হয় এবং হেতু প্রত্যয়ের অভাবে বিলয় বা ধ্বংস হয়ে থাকে। কিন্তু নির্বাণ ঐ পরমার্থ ধর্মত্রয় হতে সম্পূর্ণভাবে আলাদা ও ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ, নির্বাণ হচ্ছে স্কন্ধ ও হেতু প্রত্যয় ধর্মের অনাধীন ও মুক্ত। যার ফলে পরমার্থ ধর্ম নির্বাণের বিলয়, বিনাশ, ধ্বংস বা অনিত্যতা অবিদ্যমান। হেতু প্রত্যয় ধর্মের অনাধীন এই পরমার্থ ধর্ম নির্বাণ সর্বদা স্থির, অচল ও অবিচল স্বভাবের হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, যে ধর্ম সমূহ হেতু প্রত্যয়োৎপন্ন সে ধর্ম সমূহের বিনাশ বা ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। কিন্তু নির্বাণ হেতু প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম নয় বিধায় নির্বাণের উৎপত্তি কিংবা ধ্বংস নাই। সে হেতু নির্বাণ সর্বদা স্থির, অচল, অজর, অমর ও অচ্যুত স্বভাব বিশিষ্ট। তবে লক্ষণ ভেদে নির্বাণ এক প্রকার। কারণ নির্বাণ সর্বদা “শান্তি” লক্ষণ যুক্ত। নির্বাণের এই সুখ বেদয়িত নহে, অবেদয়িত। বেদয়িত সুখ ক্লেশ যুক্ত কিন্তু নির্বাণের সুখ ক্লেশ মুক্ত বা ক্লেশ নিরোধ জনিত সুখ। যেমন, বেদয়িত সুখ বিদ্যমান রোগাদির উপদ্রব যুক্তের ন্যায় আর নির্বাণ সুখ রোগাদি সমূলে নিরাময় বা উপশমের ন্যায়। সে হেতু বিদ্যমান রোগাদি যুক্ত সুখ হতে রোগাদি মুক্ত জনিত সুখ অতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার ন্যায় নির্বাণ সুখও বেদয়িত বা ক্লেশ যুক্ত সুখ হতে অতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ। এখানে কারণ ও পর্যায় ভেদে নির্বাণ দুই প্রকার। যথাঃ ১. স-উপাদিসেস নির্বাণ ও ২. অনুপাদিসেস নির্বাণ।

ক) স-উপাদিসেস নির্বাণ - বলতে নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান বা প্রবর্তন কালে লোকুত্তর মার্গ জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষণে ক্লেশবর্তকে বিনাশ পূর্বক যে নিরোধ সত্য দর্শন বা অধিগত করা হয় তাকেই “স-উপাদিসেস নির্বাণ” বলে। মূলত ক্লেশ নির্বাণকেই স-উপাদিসেস নির্বাণ বলা হয়। যারা জীবন প্রবর্তন কালে স-উপাদিসেস নির্বাণ দর্শন বা অধিগত করেন, সে পুদালের সংখ্যা চার জন।

১. শ্রোতাপন্ন পুদাল - যে পুদাল পৃথকজন গোত্র হতে আর্য গোত্রে পদার্পণ করেছেন অথবা নির্বাণ শ্রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সে পুদালকেই “শ্রোতাপন্ন পুদাল” বলে। শ্রোতাপন্ন পুদাল শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞানের উৎপত্তি ক্ষণে বিশ প্রকার সংকায় দৃষ্টি, বাষট্টি প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি, দশ প্রকার অনতল্লাহিক দৃষ্টি, তিন প্রকার নিয়ত মিথ্যা দৃষ্টি, ষোল প্রকার বিচিকিৎসা সহ শীলব্রতপরমর্শাদি সমূলে বিনাশ বা ছেদন করে থাকেন। এরূপ শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞানলাভী শ্রোতাপন্ন পুদাল কর্তৃক ত্রি-দ্বারে (কায়, বাক্য ও মন) প্রাণীহত্য, চুরি, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা বাক্য, ককর্শ বাক্য, পিণ্ডন বাক্যাদি, নেশাদ্রব্য সেবন করা সহ সকল প্রকার অকুশল কর্ম হতে বিরত হয়ে থাকে এবং চারি অপায়ের (তির্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয়) দরজা তাদের জন্য চিররুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ শ্রোতাপন্ন পুদালেরা চারি আপায়ে জন্ম গ্রহণ করার কারণকে সম্পূর্ণভাবে নিরোধ করে থাকেন। শ্রোতাপন্ন পুদালেরা কাম সুগতি ভূমিতে সাত জন্মের অধিক জন্ম গ্রহণ করেন না; সপ্তম জন্মেই তাঁদের অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ অবশ্যম্ভাবী।

২. স্কৃদাগামী পুদাল - যে পুদাল শ্রোতাপত্তি মার্গ -ফল লাভ করার পর স্কৃদাগামীত্ব লাভ করে, তখন সে স্কৃদাগামী মার্গ জ্ঞানের দ্বারা কামরাগ ও ব্যাপাদ এই ক্লেশদ্বয়ের স্থুরাংশকে সমূলে বিনাশ বা ছেদন করে থাকে। স্কৃদাগামী পুদালের কামরাগ ও ব্যাপাদ এই ক্লেশদ্বয় কেবলমাত্র অনুশয়াকারে চিত্ত সন্ততিতে বিদ্যমান থাকে। স্কৃদাগামী মার্গলাভী পুদালেরা কাম সুগতি ভূমিতে এক জন্মের অধিক জন্ম গ্রহণ করে না - কেবলমাত্র একবার জন্ম গ্রহণ

করে তাঁদের অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ অবশ্যম্ভাবী।

৩. **অনাগামী পুদাল** যে পুদাল অনাগামী মার্গ জ্ঞানের দ্বারা কামানুশয় ও ব্যাপাদানুশয় এই ক্লেশানুশয়কে সমূলে বিনাশ বা ধ্বংস করে এবং কাম সুগতি ভূমিতে আর আগমন বা জন্ম গ্রহণ করেনা বলেই সে পুদালকেই “অনাগামী পুদাল” বলে। অনাগামী পুদালেরা কেবলমাত্র শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক ভূমিতে একবার জন্ম গ্রহণ পূর্বক সেখানেই অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করে থাকেন।

৪. **অরহত্ত্ব পুদাল** যে পুদাল অরহত্ত্ব মার্গ জ্ঞানের দ্বারা রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা সহ সকল প্রকার ভব সংযোজনের ক্লেশরাশিকে সমূলে বিনাশ বা ছেদন করেছেন, তাকেই - “অরহত্ত্ব পুদাল” বলে। অরহত্ত্ব মার্গলাভীগণ ত্রিলোকে (কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক) আর জন্ম গ্রহণ করে না ইহাই তাদের অন্তিম বা শেষ জন্ম। যেহেতু ত্রিলোকে জন্ম গ্রহণ করার সমস্ত ভব সংযোজনের ক্লেশ তাদের চিত্ত হতে সমূলে ছেদন বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে।

খ) **অনুপাদিসেস নির্বাণ** - কর্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহারজ ধর্ম অথবা হেতু প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্মের নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের আবর্তন পরিসমাপ্তি বা নিরোধকেই “অনুপাদিসেস নির্বাণ” বলে। অনুপাদিসেস নির্বাণকে অন্য অর্থে “স্কন্ধ নির্বাণ” ও “মহা অসংস্কৃত নির্বাণ ধাতু” বলা হয়ে থাকে। স-উপাদিসেস নির্বাণ ক্লেশ মুক্ত কিন্তু বিপাকাধীন অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান। অন্যপক্ষে অনুপাদিসেস নির্বাণ ক্লেশ এবং বিপাক উভয় হতে বিমুক্ত।

আকার ভেদে নির্বাণ তিন প্রকার

যথাঃ

১. **সুঞ্ঞতা নির্বাণ**- বলতে সকল প্রকার পলিবোধ (মার্গ লাভের বাধা-বিপত্তি) মূলক ক্লেশবর্তের অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদানাদির শূন্যতা বা অবিদ্যমানতাকেই “সুঞ্ঞতা বা শূন্যতা নির্বাণ” বলে।

২. অনিমিত্ত নির্বাণ- বলতে দুঃখ সত্য নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তির মূল কারণ সমুদয় সত্য অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদানাদির অবিদ্যমানতা, নিমিত্তিহীনতা বা আকার-আকৃতি বিহীনতাকেই - “অনিমিত্ত নির্বাণ” বলে। সংস্কৃত ধর্ম সমূহের মধ্যে নিমিত্ত বা আকার-আকৃতি আদি বিদ্যমান থাকে। যেমন কোন কিছুর চিহ্ন, আকার-আকৃতি, নিমিত্ত, দিগ্-বিদিগ্, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত ইত্যাদি। কিন্তু অসংস্কৃত ধর্মের মধ্যে এরূপ কোন আকার-আকৃতি বা নিমিত্তাদি অবিদ্যমান হেতু ‘অনিমিত্ত’ ইত্যাদি বলা হয়েছে।

৩. অঙ্গনিহিত নির্বাণ - বলতে ষড়ালম্বন (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম) ও ত্রিলোকের (কাম, রূপ ও অরূপলোক) প্রতি কোন প্রকার কামনা বা আসক্তিহীনতা অথবা ত্রিলোকের সমস্ত বিষয় বস্তুর প্রতি বিরাগতাকেই - “অঙ্গনিহিত নির্বাণ” বলে।

সাত প্রকার নির্বাণ

যথাঃ ১. মিথ্যাদৃষ্টি নির্বাণ, ২. সম্মুতি নির্বাণ ৩. তদাজ্ঞ নির্বাণ ৪. বিকল্পন নির্বাণ ৫. সমুচ্ছেদ নির্বাণ ৬. প্রতিপ্রসঙ্গি নির্বাণ ও ৭. নিস্সরণ নির্বাণ। উক্ত সাত প্রকার নির্বাণকে নিম্নে শ্রেণী বিভাগ করে বর্ণনা করা হল।

১. মিথ্যাদৃষ্টি নির্বাণ - বলতে ধর্ম-বিনয় শাসনের বহির্ভূত মিথ্যা দৃষ্টিকগণের ধারণকৃত, উপলব্ধি কৃত ও ভাষিত নির্বাণকেই “মিথ্যাদৃষ্টি নির্বাণ” বলে। এই মিথ্যাদৃষ্টি নির্বাণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

ক) কিছু কিছু মনুষ্য ও দেবতা আছে, যারা অবিরত পঞ্চ কাম সুখে নিমগ্ন হয় এবং এতে তারা তুষ্ট ও আনন্দিত হয়ে থাকে। এই পঞ্চকাম সুখে তারা এমনভাবে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে, তখন তাদের এরূপ ভাবোদয় হয় যে, “বোধ হয় ইহার চাইতে আর সুখ নাই, ইহায় উত্তম, ইহায় শ্রেষ্ঠ এবং ইহায় দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় নির্বাণ সুখ” বলে আখ্যায়িত করে থাকে। ইহায় মিথ্যাদৃষ্টিগণের প্রথম নির্বাণ।

খ) অনেকে আছে যারা জাগতিক সকল কাম সুখ ত্যাগ করে ঋষি

প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক কঠোর সাধনার ব্রতানুষ্ঠান করে প্রথম ধ্যান লাভ করে এবং এতে তারা প্রথম ধ্যান সুখে সর্বদা নিমজ্জিত হয়ে থাকে। ফলে তাদের এরূপ ভাবোদয় হয় যে, - “বোধ হয় ইহায় অগ্র, ইহায় শ্রেষ্ঠ এবং ইহার চাইতে আর মহোত্তর সুখ নাই, ইহাই দৃষ্টধর্ম বেদনীয় নির্বাণ সুখ” বলে ধারণা করে থাকে। ইহায় মিথ্যাদৃষ্টিগণের দ্বিতীয় নির্বাণ।

গ) অনেক পুণ্ডল আছে যারা জাগতিক সকল কাম সুখ ত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক কঠোর সাধনার ব্রতানুষ্ঠান করে দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে এবং এতে তারা দ্বিতীয় ধ্যান সুখে সর্বদা নিমজ্জিত হয়ে থাকে। ফলে তাদের এরূপ ভাবোদয় হয় যে, - “বোধ হয় ইহায় অগ্র, ইহায় শ্রেষ্ঠ এবং ইহার চাইতে আর মহোত্তর সুখ নাই, ইহাই দৃষ্টধর্ম বেদনীয় নির্বাণ সুখ” বলে ধারণা করে থাকে। ইহায় মিথ্যাদৃষ্টিগণের তৃতীয় নির্বাণ।

ঘ) কিছু কিছু লোক আছে যারা জাগতিক সকল কাম সুখ ত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক কঠোর সাধনার ব্রতানুষ্ঠান করে তৃতীয় ধ্যান লাভ করে এবং এতে তারা তৃতীয় ধ্যান সুখে সর্বদা নিমজ্জিত হয়ে থাকে। ফলে তাদের এরূপ ভাবোদয় হয় যে, - “বোধ হয় ইহায় অগ্র, ইহায় শ্রেষ্ঠ এবং ইহার চাইতে আর মহোত্তর সুখ নাই, ইহাই দৃষ্টধর্ম বেদনীয় নির্বাণ সুখ” বলে ধারণা করে থাকে। ইহায় মিথ্যাদৃষ্টিগণের চতুর্থ নির্বাণ।

ঙ) অনেকে আছে যারা জাগতিক সকল কাম সুখ ত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক কঠোর সাধনার ব্রতানুষ্ঠান করে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে এবং এতে তারা চতুর্থ ধ্যান সুখে সর্বদা নিমজ্জিত হয়ে থাকে। ফলে তাদের এরূপ ভাবোদয় হয় যে, - “বোধ হয় ইহায় অগ্র, ইহায় শ্রেষ্ঠ এবং ইহার চাইতে আর মহোত্তর সুখ নাই, ইহাই দৃষ্টধর্ম বেদনীয় নির্বাণ সুখ” বলে ধারণা করে থাকে। ইহায় মিথ্যাদৃষ্টিগণের পঞ্চম নির্বাণ।

২. সম্মুতি নির্বাণ - বলতে জাগতিক বা লৌকিক সকল প্রকার সুখ-

শান্তি লাভ করাকেই “সম্মুতি নির্বাণ” বলে। যেমন কেউ যদি চারি অপায়, পঞ্চবৈরী, দশবিধ দণ্ড, ষোল প্রকার উপদ্রব, পঁচিশ প্রকার বিপত্তি, ছিয়ানক্সই প্রকার রোগ সহ সকল প্রকার অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্ত হয়ে মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, ধন-ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, মান-যশ-খ্যাতি সহ জাগতিক সকল প্রকার সুখ-শান্তি লাভ করতঃ দীর্ঘজীবী হয়ে কায়িক ও মানসিক সুখ প্রাপ্ত হওয়াকে “সম্মুতি নির্বাণ” নামে উক্ত।

৩. তদাঙ্গ নির্বাণ - বলতে কুশল ধর্মের দ্বারা অকুশল ধর্মকে সাময়িকভাবে বিনাশ করা বা প্রহাণ করাকেই “তদাঙ্গ নির্বাণ” বলে। যেমন, রোগ-ব্যাদিকে ভৈষজ্য চিকিৎসাদির দ্বারা সাময়িকভাবে নিরাময় করার ন্যায় বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যাকে, মৈত্রীর দ্বারা দ্বেষকে বা হিংসাকে, অলোভের দ্বারা লোভকে অথবা কুশল ধর্মের দ্বারা অকুশল ধর্মকে সাময়িকভাবে প্রহাণ করাকেই “তদাঙ্গ নির্বাণ” রূপে জ্ঞাতব্য।

৪. বিক্খম্ভন নির্বাণ বলতে মহদগত ধ্যানাদি (রূপাবচর ও অরূপাবচর ধ্যান) শক্তির দ্বারা ক্লেশ সমূহকে প্রহাণ পূর্বক বহু কল্পকাল পর্যন্ত ক্লেশ-মুক্তাবস্থায় অবস্থান করাকেই “বিক্খম্ভন নির্বাণ” বলে। যেমনঃ রূপাবচর প্রথম ধ্যানলাভী মহাব্রহ্মা এক কল্প এবং নৈব সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়নতন অরূপাবচর ধ্যানলাভী ব্রহ্মাণী চুরাশি হাজার কল্প পর্যন্ত ক্লেশ সমূহ হতে মুক্ত হয়ে অবস্থান করে থাকে। তখন তাদের ক্লেশ সমূহ সম্পূর্ণরূপে অনুশয়াকারে (ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায়) বিদ্যমান থাকে মাত্র।

৫. সমুচ্ছেদ নির্বাণ - বলতে অরহত্ত্ব মার্গ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত ক্লেশ সমূহকে সমূলে প্রহাণ করা বা ছেদন করাকেই “সমুচ্ছেদ নির্বাণ” বলে। সমুচ্ছেদ নির্বাণের অন্য নাম ক্লেশ নির্বাণ ও স-উপাদিসেস নির্বাণ।

৬. পটিপস্সদ্ধি নির্বাণ - বলতে সমস্ত ক্লেশ সমূহের উপশম বা নিরোধ জনিত অরহতের ফলজ প্রশান্তিকেই “পটিপস্সদ্ধি নির্বাণ” বলে। যেমন দুরারোগ্য রোগের সমূল উপশম হলে, যেরূপ উপশম জনিত প্রশান্তি

লাভ হয়, ঠিক সেরূপে যখন অরহত্ব মার্গ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত ক্লেশ সমূহকে সমূলে প্রহাণ বা বিনাশ করা হয়, তখন ক্লেশ সমূহের নিরোধ জনিত যে প্রশান্তি লাভ হয় তাহাই “পটিপস্‌সন্ধি নির্বাণ”।

৭. নিস্সরণ নির্বাণ - বলতে সমস্ত হেতু প্রত্যয় যুক্ত সংস্কৃত ধর্ম সমূহ হতে নিঃসরণ পূর্বক পরমার্থ ধর্ম মহা অসংস্কৃত ধাতু নির্বাণকে অধিগত করা এই অর্থেই “নিস্সরণ নির্বাণ” বলা হয়। এখানে নিস্সরণ নির্বাণ দুই প্রকার। যেমনঃ ১. ক্লেশ নিস্সরণ নির্বাণ এবং ২. স্কন্ধ নিস্সরণ নির্বাণ। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান কালে মার্গ জ্ঞানের দ্বারা ক্লেশ সমূহকে প্রহাণ পূর্বক যে নির্বাণ অধিগত হয় তাহাই “ক্লেশ নিস্সরণ নির্বাণ”। ক্লেশ নিস্সরণ নির্বাণের অন্য নাম ‘ক্লেশ নির্বাণ’ ও ‘স-উপাদিসেস নির্বাণ’। ক্লেশ এবং স্কন্ধ উভয়কে সমূলে প্রহাণ করে যে নির্বাণ অধিগত করা হয়, তাহাই “স্কন্ধ নিস্সরণ নির্বাণ”। স্কন্ধ নিস্সরণ নির্বাণের অন্য নাম অনুপাদিসেস নির্বাণ।

সমাণ্ত

অত্র গ্রন্থ প্রকাশে যারা শ্রদ্ধাদান প্রদান করেছেন

১।	পঞ্চাঙ্গানন্দ মহাথের রোয়াংছড়ি কেন্দ্রিয় জেতবন বিহার	২০০০/-
২।	শ্রীমৎ অগ্নিশ্রীথের, পাগলাছড়া বৌদ্ধ বিহার, রোয়াংছড়ি	৫০০০/-
৩।	শ্রীমৎ ইন্দ্রবংশ ভিক্ষু, মাগাইন পাড়া বৌদ্ধ বিহার, রাজস্থলী	১০০/-
৪।	শ্রীমৎ অমৃতানন্দ ভিক্ষু, দক্ষিণ ছিলোনীয়া জিনারাম বিহার	১০০০/-
৫।	শ্রীমৎ ধর্মানন্দ ভিক্ষু, ওয়াগ্লা সাতছড়ি বৌদ্ধ বিহার	১০০০/-
৬।	নিখিল তঞ্চঙ্গ্যা, রেইছা, সাতকমল পাড়া	১০১০/-
৭।	রাতচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্যা পাড়া, বাঘমারা	৫০০/-
৮।	সুগন্ধি তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্যা পাড়া, বাঘমারা	১০৯১/-
৯।	পিটু বড়ুয়া, লোহাগাড়া, সাতকানিয়া	৫০০/-
১০।	ঝর্ণা বিজয় পাড়া, রোয়াংছড়ি	১১০০/-
১১।	দুরন সেন তঞ্চঙ্গ্যা ও কান্দুরী তঞ্চঙ্গ্যা বিলাইছড়ি	৫০০/-
১২।	তেজপ্রিয় ভিক্ষু, বিলাইছড়ি	১০০/-
১৩।	শান্তনা তঞ্চঙ্গ্যা, বালাঘাটা, বান্দরবান	৫০০/-
১৪।	দেবী তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্যা পাড়া, বাঘমারা	১৫০০/-
১৫।	অনিতা তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্যা পাড়া, বাঘমারা	২০০০/-
১৬।	মংহলা মার্মা, রোয়াংছড়ি	১০০/-
১৭।	মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ও তার পরিবার বর্গ, চিক্যা পাড়া, বাঘমারা	৩০০০/-
১৮।	স্নেহ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও তার পরিবারবর্গ, চিক্যা পাড়া	৩০০০/-
১৯।	মং শৈ প্র মার্মা, রাজবিলা	৫০০/-
২০।	শৈ মহলা মার্মা, রাজবিলা	৩০০/-
২১।	লক্ষ্মীদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, চিক্যা পাড়া, বাঘমারা	১০০/-
২২।	শ্রীমৎ মঙ্গলতিষ্য ভিক্ষু, সাফছড়ি বৌদ্ধ বিহার	১০০/-
২৩।	সুনন্দা তঞ্চঙ্গ্যা কর্তৃক সংগৃহীত শ্রদ্ধাদান	৩৪৭০/-
২৪।	সুরেশ তঞ্চঙ্গ্যা, নয়াঝিড়ি পাড়া, রাজস্থলী	১০০/-
২৫।	রাঙাধন কার্বারী, নয়াঝিড়ি পাড়া, রাজস্থলী	১০০০/-
২৬।	জয়ন্তি তঞ্চঙ্গ্যা, নয়াঝিড়ি পাড়া, রাজস্থলী	১০০০/-
২৭।	নিবারণ তঞ্চঙ্গ্যা, নারামুখ পাড়া, রাজস্থলী	১০০০/-
২৮।	বাগ্নি তঞ্চঙ্গ্যা, রাজস্থলী বাজার, রাজস্থলী	৩০০/-
২৯।	প্রণতি চাক্মা, রাজস্থলী	৬০০/-
৩০।	নয়ঝিড়ি পাড়া মহিলা সমিতি	১০০০/-

৩১।	গান্ধি তঞ্চঙ্গ্যা, নয়াঝিড়ি পাড়া রাজস্থলী	১০০০/-
৩২।	গণেশ তঞ্চঙ্গ্যা, আনছড়ি পাড়া রাজস্থলী	৫০০/-
৩৩।	করুণা তঞ্চঙ্গ্যা ও জিতা তঞ্চঙ্গ্যা, নারামুখ পাড়া	১০০০/-
৩৪।	রাজস্থলী সদর ত্রিপুর বৌদ্ধ বিহারের সেবক সংঘ	২৫৯৭/-
৩৫।	জলেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, নারামুখপাড়া, রাজস্থলী	৫০০/-
৩৬।	আশীষ তঞ্চঙ্গ্যা, নারামুখ পাড়া, রাজস্থলী	১০০/-
৩৭।	রেণু তঞ্চঙ্গ্যা, নারামুখ পাড়া, রাজস্থলী	১৫/-
৩৮।	পুষ্প তঞ্চঙ্গ্যা, নারামুখ পাড়া, রাজস্থলী	১৫/-
৩৯।	নৈছা প্রু চৌধুরী, (হিসাবরক্ষণ অফিস), রাজস্থলী	৫০০/-
৪০।	এগনাপালা শ্রমণ পাহাড়তলী, রাউজান, কদলপুর	১১০/-
৪১।	প্রত্ন কুমার, ঘনাপাড়া, রেইছা	৫০০/-
৪২।	নমিতা সাধু কর্তৃক সংগৃহীত শ্রদ্ধাদান	১০৫০/-
৪৩।	দিলীপ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও নিলু তঞ্চঙ্গ্যা, নারামুখ পাড়া, রাজস্থলী	২০০৫/-
৪৪।	বুলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, নয়াঝিড়ি পাড়া, রাজস্থলী	৫০০/-
৪৫।	বিপ্লব তঞ্চঙ্গ্যা, নয়াঝিড়ি পাড়া, রাজস্থলী	২০০০/-
৪৬।	সেনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, আমছড়া পাড়া, রাজস্থলী	৫০০/-
৪৭।	বিরনমালা তঞ্চঙ্গ্যা, নারায়ণ মুখপাড়া, রাজস্থলী	১০০১/-
৪৮।	উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা, নয়াঝিড়ি পাড়া, রাজস্থলী	২০০/-
৪৯।	সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা, বাজার পাড়া, রাজস্থলী	৫০০/-
৫০।	জ্ঞান রানী তঞ্চঙ্গ্যা, নিউ গুলাশান, বান্দরবান	৫০০/-